আনন্দমেলা

১২ অগস্ট ১৯৮১ • আনন্দবাজার-প্রকাশ

২৲

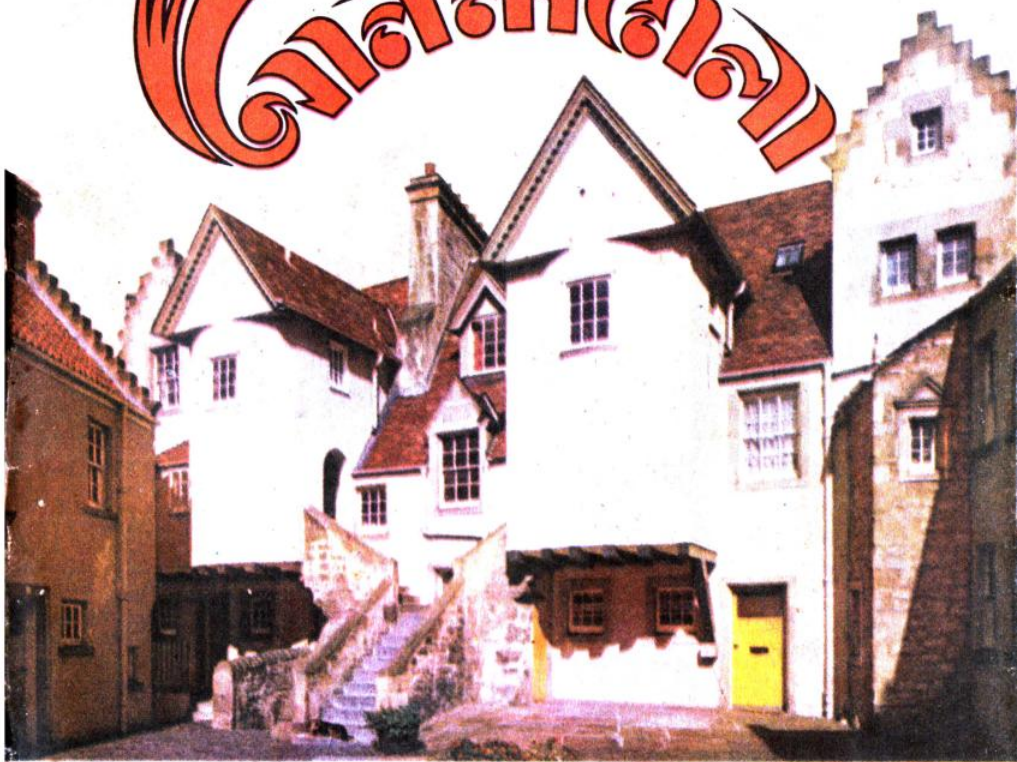

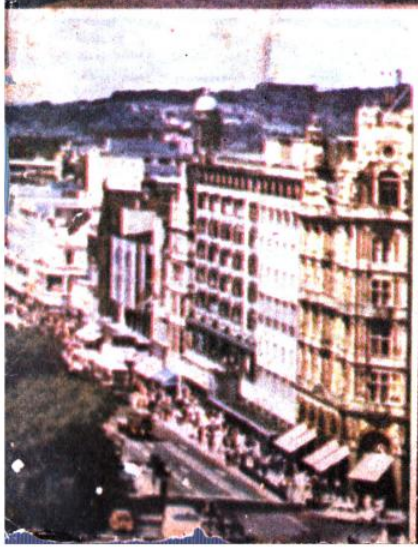

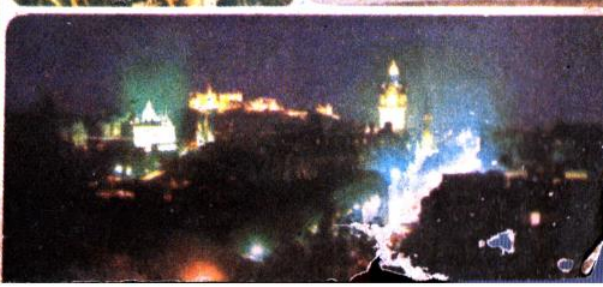

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ। রেক্সোনা মেখে স্নান করুন— এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 BG

আনন্দমেলা

২৭ শ্রাবণ ১৩৮৮ • ১২ অগস্ট ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ৯ সংখ্যা

ছড়া

থাক যতদিন ইচ্ছে-টিচ্ছে । শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৯
মিলমিশ । রাখাল বিশ্বাস ৫৯
বল তো দেখি । অলোকনাথ মুখোপাধ্যায় ৫৯

গল্প

দাদুর দ্বিতীয় ইঁদুর । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ১০
মেখলিগঞ্জে একরাত্রি । দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪
ডাকাত চিতপটাং । জীবন ভৌমিক ৩৭
মহারাজের দেওয়ালি । সুব্রত নিয়োগী ৫৩

উপন্যাস

সিসের আঙটি । বিমল কর ১৬
হারানো কাকাতুয়া । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৪৮

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ২০

ভ্রমণকাহিনী

রূপসী এডিনবরা । পার্থসারথি চক্রবর্তী ৪

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল । পি. কে. ৫০

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স

সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

লেখাপড়া

বাংলা বলো । বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

অন্যান্য আকর্ষণ

ছবির মজা ২৩, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৯, আঁকো-শেখো ৬৬

খেলাধুলো

মাঝমাঠের ভরসা । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪২
ফুটবল ও ব্রাজিল । শ্যামসুন্দর ঘোষ ৪৩
উইম্বলডন থেকে । ডেভিড ম্যাকম্যাহন ৪৫

ফরিদের পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু' টাকা

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

সর্দিতে একটি দিনও বৃথা না যায়

সর্দির কষ্ট থেকে আরাম পাওয়া যায়

সর্দির যে সব লক্ষণ সুন্দর দিনগুলোকে একেবারে মাটি করে দেয়, যেমন—নাক থেকে জল পড়া বা নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, মাথা ভার, গলা খারাপ, বুকে সর্দি বসা—তা থেকে আরাম পাবার উপায় আছে।

সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়ে সর্দি থামান

যেকোনো অসুখের মত চিকিৎসা করলেই যথেষ্ট নয়। সর্দির বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করুন যা একই সঙ্গে শরীরের সমস্ত আক্রান্ত অংশে কাজ করে।

কোল্ডরিন শুধু সর্দির জন্যেই

কোল্ডরিন সর্দির যাবতীয় কষ্টকর লক্ষণ থেকে আরাম দেয়। এর বিশেষ উপাদানগুলি সর্দিতে আক্রান্ত সমস্ত অংশে একই সঙ্গে কাজ করে। তাছাড়া, এতে যে ভিটামিন 'সি' আছে তা আপনাকে সর্দি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যোগায়। সর্দি হলে, তার চিকিৎসা সর্দির বিশেষ ওষুধ দিয়েই তো করা উচিত!

কোল্ডরিন

সর্দির জন্যে সর্দির বিশেষ ওষুধ

CASBC-64-192 BN

রূপসী এডিনবরা

পার্থসারথি চক্রবর্তী

পাইপ মেজর ও ড্রাম মেজর। এডিনবরা দুর্গের সামনে

জানুয়ারির মাঝামাঝি। এডিনবরা স্টেশনে যখন পৌঁছলাম তখন বিকেল সাড়ে-তিনটা। কনকনে শীতের হাওয়া সারা শরীরে চাবুকের মতো লাগছে। এখনও বেলা কত পড়ে আছে, তবু চারদিকে অন্ধকার। প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে দেখি ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

আমার সঙ্গে রয়েছেন অধ্যাপক এস ও ওয়াহেদ সাহেব। উনি এসেছেন জর্ডান থেকে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে এবং স্কটল্যাণ্ডের বিজ্ঞান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সর্বশেষ খবর জানতে আমরা এখানে এসেছি।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা দুজনে সোজা গেলাম এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোরে হাউসে। জিম জার্ডিন এখানে ফিজিক্স ডিপার্টমেণ্টের প্রফেসর। জিম আমার বহুকালের বন্ধু। লেখক ও গবেষক আমার এই স্কটিশ বন্ধুটির মতো হুজুগে ও অতিথি-বৎসল লোক জীবনে কমই দেখেছি। কফি আর স্ন্যাক্স খাবার পর জিম ঠিক করল, এডিনবরায় থাকাকালীন আমাদের ওর ফোর্থ-ব্রিজের বাড়িতে অতিথি হতে হবে। আজ সন্ধ্যা থেকেই

শুরু হবে এডিনবরাকে আবিষ্কার করা। জিমের মতে রাত্রিতেই **এডিনবরার** রূপ নাকি খোলে সবচেয়ে বেশি।

এডিনবরার মতো এত চমৎকার শহর পৃথিবীতে খুব কমই আছে। দেখলে মনে হয়, আগ্নেয়গিরির ঠিক মুখের উপর গড়ে উঠেছে এই সুন্দর শহরটা। বহু প্রাচীন কাল থেকে এখনও পর্যন্ত এডিনবরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানশিক্ষার পীঠস্থান। চিকিৎসা-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিদ্যা এবং রসায়নে যে কত নোবেল পুরস্কার এডিনবরার গুণী ব্যক্তিদের ভাগ্যে জুটেছে তা বলে শেষ করা যাবে না। ক্লোরোফর্মের আবিষ্কর্তা সিম্পসন এবং অ্যান্টিসেপটিক পদ্ধতির আবিষ্কর্তা লর্ড লিস্টারের নাম দুনিয়ার কে না জানে? আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলও (টেলিফোন আবিষ্কার করে যিনি পৃথিবী-বিখ্যাত হয়েছেন) এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রবার্ট বার্নস, অলিভার গোল্ডস্মিথ, স্যার ওয়াল্টার স্কট, রবার্ট লুই স্টিভেনসন—এই সব

রাতের মায়া-আলোকে মোহময়ী এডিনবরা

এডিনবরা শহরের দৃশ্য। আকাশ থেকে তোলা ফোটো

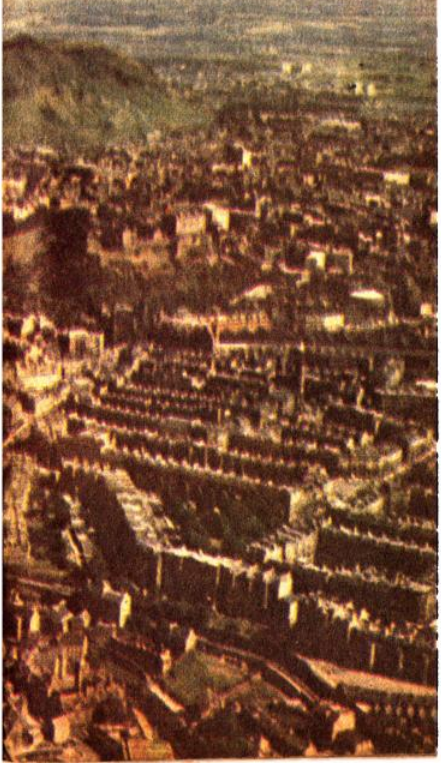

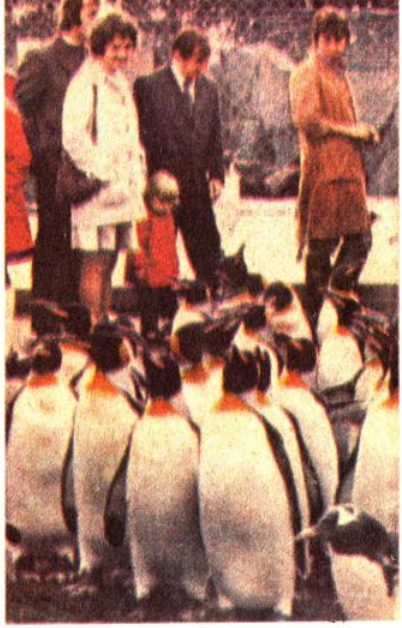

চিড়িয়াখানায়

গুণী মানুষরা সবাই এডিনবরাতেই তাঁদের সাহিত্য ও দর্শন-চর্চা করেছেন।

এডিনবরা শহরটাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। একটা শহরের পুরনো অংশ ও আরেকটা নতুন এলাকা। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জায়গা হল এডিনবরা কাসল। একাদশ শতাব্দীতে রানী মার্গারেট প্রথম এই দুর্গটিকে বাসস্থানের জন্যে ব্যবহার করেন। 'মন্স মেগ' হচ্ছে এই দুর্গের পনেরো শতকের বিখ্যাত কামান। রাজকীয় সমারোহের সময় ছাড়াও প্রতিদিন দুপুর একটায় এই কামান তোপধ্বনি করে নাগরিকদের সময় জানিয়ে দেয়। রাজপ্রাসাদের গ্রেট হলে বোধহয় বহুকাল আগে স্কটিশ পার্লামেন্ট বসত। পরে রাজা প্রথম চার্লস ও ক্রমওয়েল এটাকে জোভসভার হল হিসাবে ব্যবহার করেন। এখানে স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন যুগের অনেক অস্ত্র সাজানো রয়েছে। ব্যাগ-পাইপ বাজনা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই দুর্গে ব্যাগপাইপ বাজনার তালে তালে মিলিটারি প্যারেড দেখবার মতো। পুরনো এডিনবরায় আরও অনেক জিনিস দেখার রয়েছে। এদের মধ্যে রয়্যাল মাইল, সেন্ট গাইল্‌স ক্যাথেড্রাল, ক্যাথেড্রালের পিছনে পার্লামেন্ট হাউসের নাম করা যেতে পারে। পার্লামেন্ট হাউসকে এখন স্কটল্যাণ্ডের সুপ্রীম কোর্ট করা হয়েছে। লেডি-স্টেয়ারস হাউসের মিউজিয়াম এবং মোরে হাউসও প্রসিদ্ধ। মোরে হাউসে প্রথম চার্লসের খুব বেশি যাতায়াত ছিল। ক্রমওয়েলের কার্যকলাপের প্রধান ঘাটি ছিল একসময় এই মোরে হাউস। এখন এটি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত মোরে হাউস কলেজ অব এডুকেশন।

এডিনবরা। স্কট মনুমেন্ট থেকে তোলা ফোটো

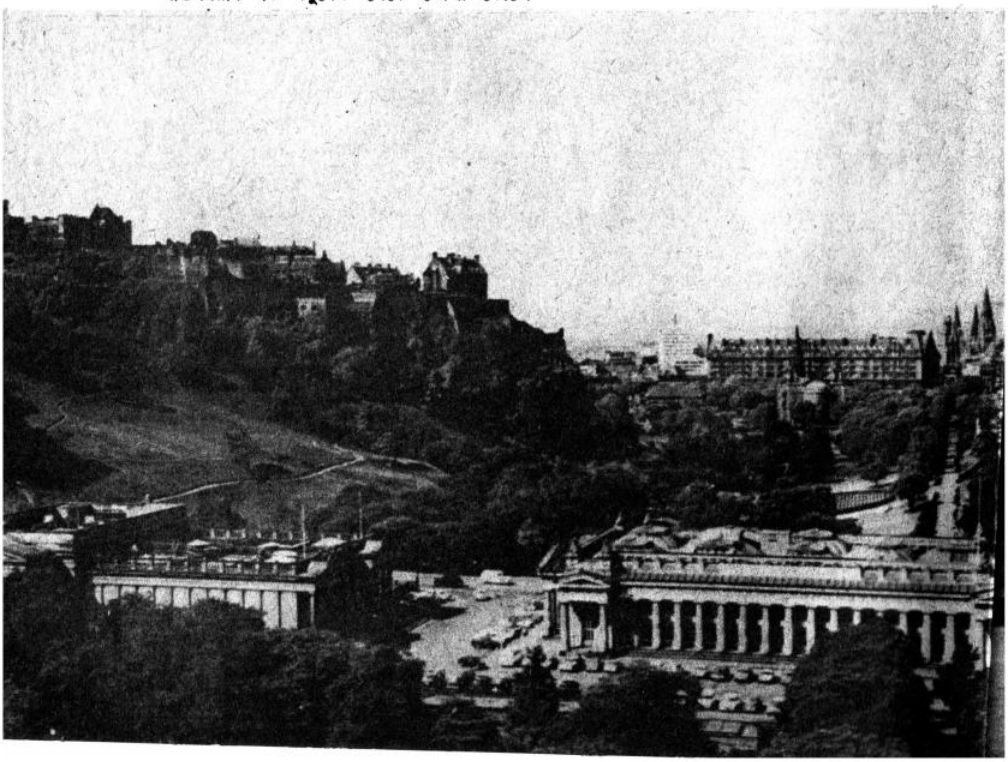

এডিনবরায় কখনও গেলে ছোট্ট পাহাড়ের কাছে বিখ্যাত প্যালেস হলিরুড হাউসকে দেখতে ভুলো না তোমরা। এই প্রাসাদকে নিজের মনের মতো করে তৈরি করেন রাজা দ্বিতীয় চার্লস ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে। এর ভিতরে ১১১ জন স্কটিশ রাজার ছবি দেখতে পাবে।

এডিনবরাকে বলা হয় 'দ্য মোস্ট এক্সসাইটিং জর্জিয়ান সিটি ইন ব্রিটেন'। নতুন শহরের প্ল্যান তৈরি হয় ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। প্ল্যান তৈরি করেন জেমস ক্রেগ নামে মাত্র তেইশ বছরের একজন আর্কিটেক্ট। আজকের সুন্দর এডিনবরা তাঁর কল্পনার ফল বলা যেতে পারে। প্রিন্সেস স্ট্রীট হচ্ছে এডিনবরার সব চাইতে বিখ্যাত রাস্তা। এ ছাড়া শার্লোট স্কোয়ারে রয়েছে সুরম্য হর্ম্যরাজি।

প্রিন্সেস স্ট্রীটের পুব দিকে দাঁড়ালে চোখে পড়বে স্যার ওয়াল্টার স্কটের মনুমেণ্ট। চার-দিকে সুন্দর ফুলের বাগান। স্কটের বিভিন্ন উপন্যাস ও কবিতা থেকে নেওয়া চৌষট্টি চরিত্রের প্রতিমূর্তি দেখতে পাবে। এর টাওয়ারের ২৮৭ ধাপ ওপরে উঠলে শহরের এক অনবদ্য দৃশ্য চোখে পড়বে। আবার বলি,

এডিনবরা শহর দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। গ্রীসিয়ান টাইপের অট্টালিকাগুলো থাকার জন্যে এডিনবরাকে বলা হয়, 'এথেন্স অব দ্য নর্থ'। এত পরিচ্ছন্ন শহর ব্রিটেনের অন্য কোথাও চোখে পড়েনি।

এডিনবরার রয়্যাল অবজারভেটরি ঊনবিংশ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগের সঙ্গে এটা এখন যুক্ত। ওখানে একজন বাঙালী অধ্যাপক রয়েছেন—প্রফেসর নন্দী।

শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান বলে এই শহরের

এডিনবরা দুর্গ। হাইল্যাণ্ডারদের প্যারেড

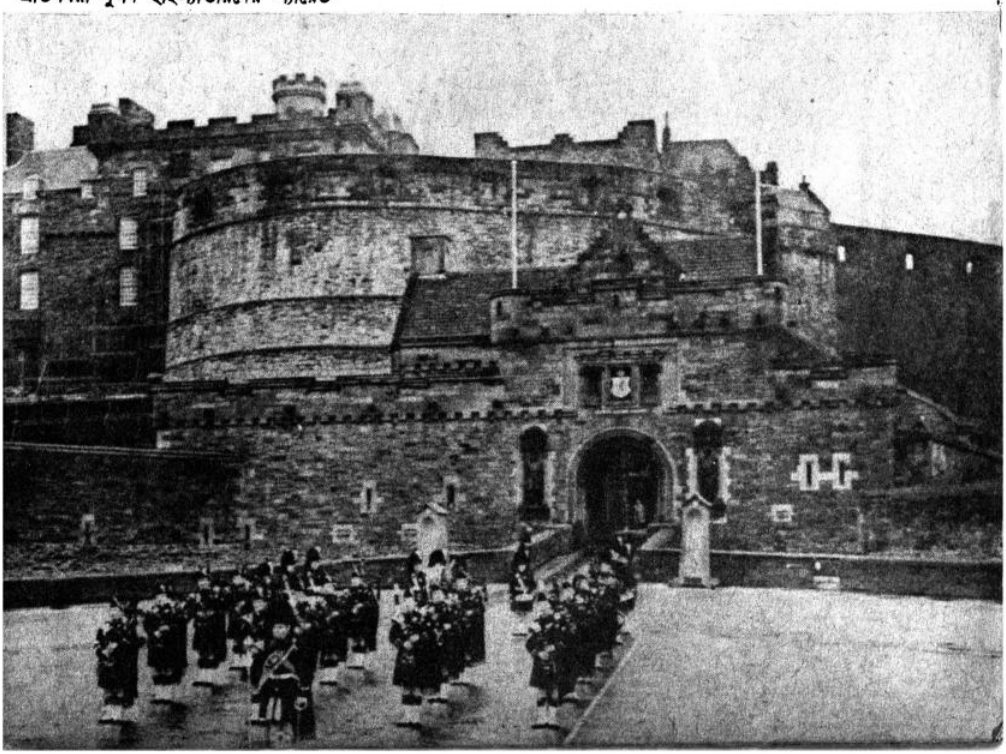

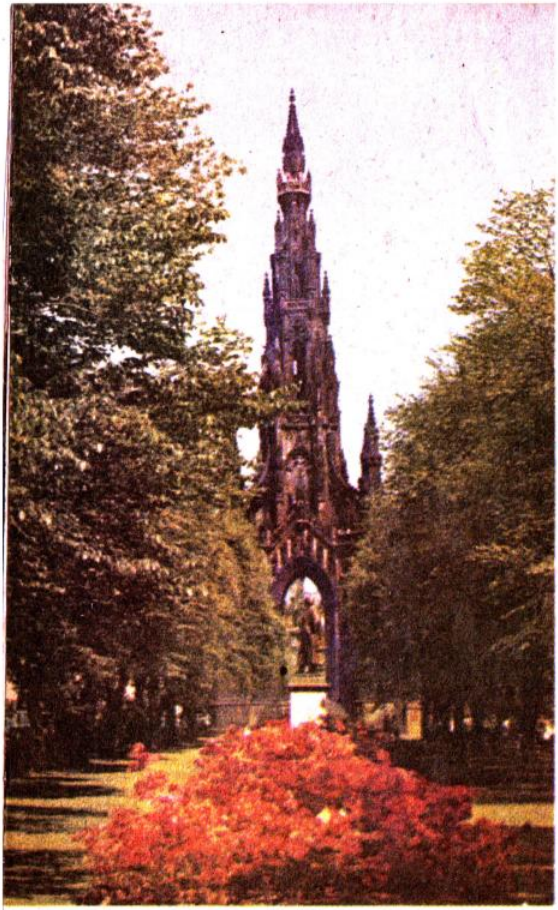

স্কট মনুমেন্ট। এডিনবরা

আর্ট সেন্টার দেখার মতো। প্রায় একশো বছরের পুরনো স্কটিশ পেইনটিং এখানে সাজানো রয়েছে। এখানে অনেক বিখ্যাত শিল্পীর চিত্রকলা দেখতে পাবে। প্রিন্সেস স্ট্রীটের ন্যাশন্যাল গ্যালারি দেখলেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

লণ্ডনের মাদাম ত্যুসোজ-এর মতো এখানে রয়েছে 'ওয়াক্স মিউজিয়াম'। ইতিহাসের বিখ্যাত সব মানুষের মোম-দিয়ে-বানানো প্রতিমূর্তি দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এগারো শতক থেকে একালের ইতিহাসের সব প্রধান ঘটনার নায়কদের এখানে দেখতে পাবে। এ ছাড়া তোমাদের জন্যে রয়েছে চমৎকার একটা 'ফ্যানটাসি ল্যাণ্ড'। এখানে এলে মনে হবে স্বপ্নের দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ!

হ্যাঁ, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য চিড়িয়াখানাও রয়েছে এডিনবরায়। পাহাড়ের কোলে প্রায় আশি একর জায়গা জুড়ে এই চিড়িয়াখানা। এখানে চিড়িয়াখানার হরেক মজার সঙ্গে ফাউ হিসাবে পাবে পেণ্টল্যাণ্ড পাহাড় ও এডিনবরা শহরের অনুপম নৈসর্গিক দৃশ্য। বাঘ, ভালুক, হাতি, হরিণ, সাপ ও বিচিত্র রঙের পাখি ছাড়াও এখানে এলে দেখবে পেঙ্গুইনের খেলা। বাচ্চা পেঙ্গুইন এখানেই বড় হতে থাকে। পেঙ্গুইনদের দল বেঁধে প্যারেড করাও দেখবার মতো।

হলিরুড হাউস প্যালেস। এডিনবরা

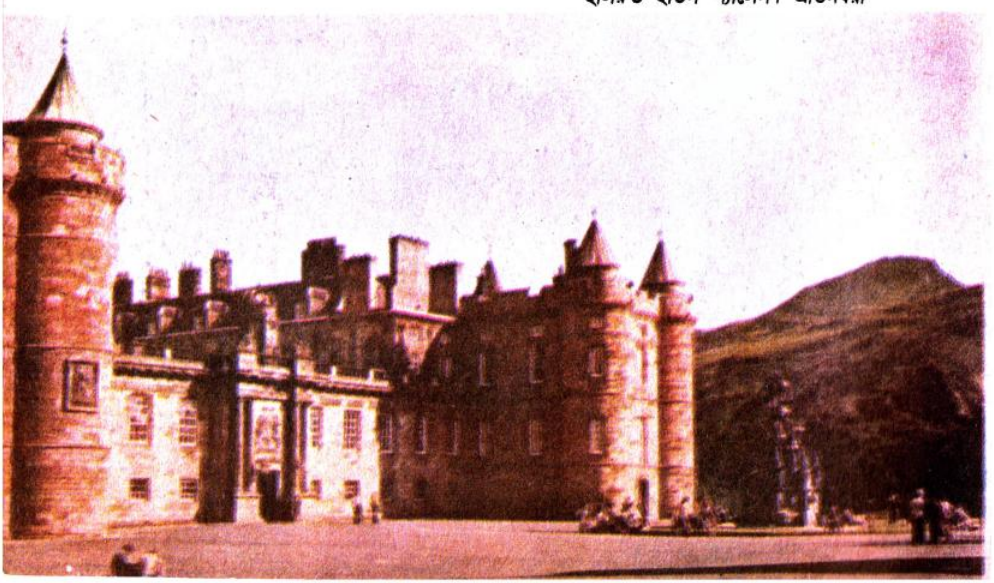

থাক যতদিন ইচ্ছে-টিচ্ছে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তালবীথি-তীর ঘেঁষটে বাড়ির
একতালাতে তিন আনাড়ির
বকম বকম পায়রা-রকম
জলকে বলে নীর উদকম্!
দূর সমুদ্রে শুশুকনাসা
পাহাড় ভালবাসতে আসা
চেপটে থাকা লেপটে থাকা
ইমলিজলে পান্তা মাখা
গালপোড়া টক নোনতা পনির
চান করে তাই গা মুছ্ছনি!
জল বলে, চল্ গোপালপুরম
খাই দধিমাছ তালের গুড়ম্,
গৌরা মূর্তি, দুই নুলিয়ার
হাত ধরে ঢেউ সই, দুলি আর
এবড়ো-খেবড়ো পাহাড় ডুবো
আয়েস করেই শরীর চুবো
থাক যতদিন ইচ্ছে-টিচ্ছে
বাপ-মা হোটেল খরচা দিচ্ছে॥

ছবি রতন সেন

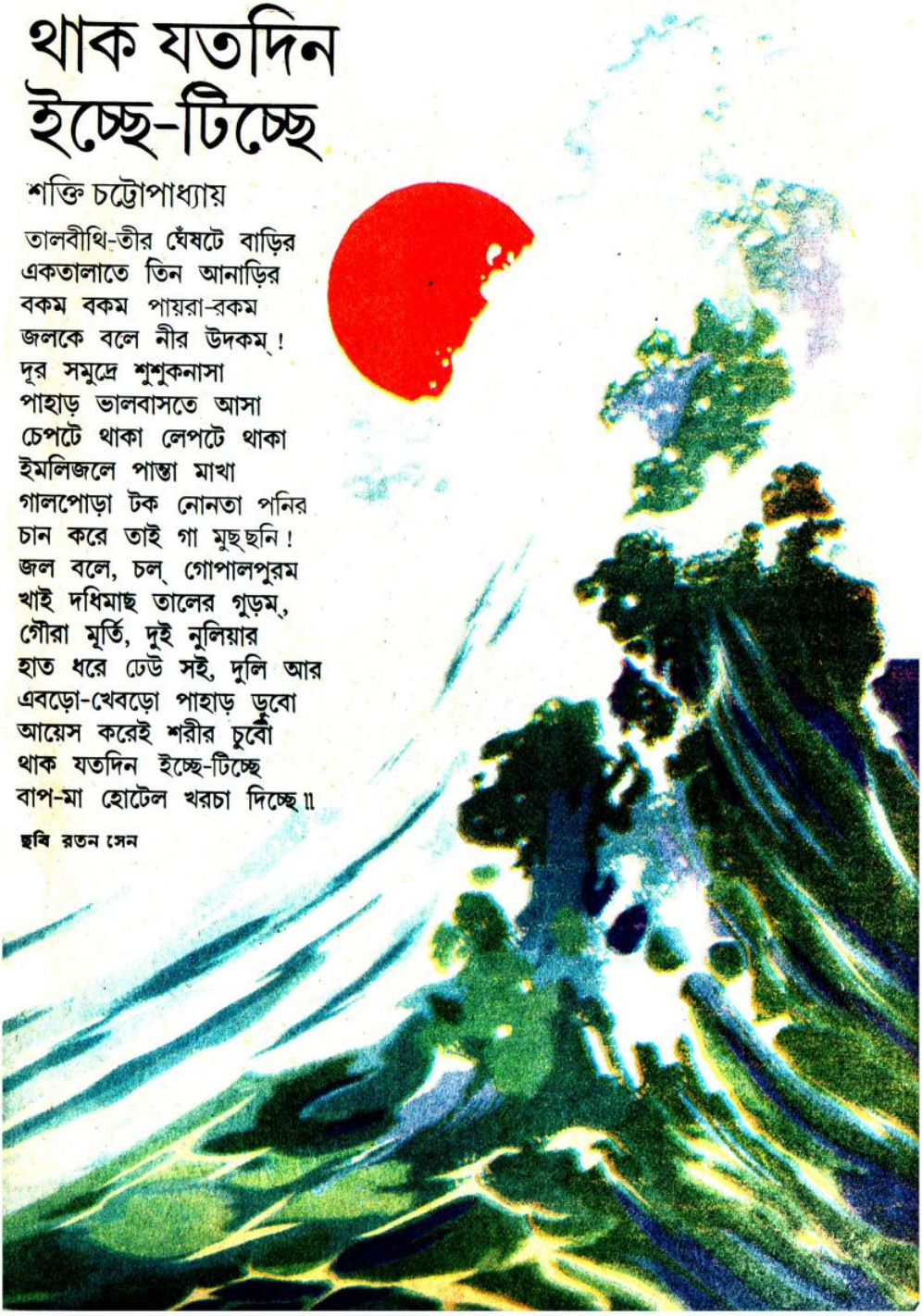

দাদুর দ্বিতীয় হঁদুর

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

মাঝরাতে দাদু একবার বাথরুমে গিয়েছিলেন। প্যানে যতটুকু জল জমে থাকে, সেই জলে তিনি যেন সরু একটা মুখ দেখতে পেলেন। জিনিসটা কী, ঘুম-চোখে ঠিক বুঝতেও পারছেন না। চোখে চশমা নেই যে, ভাল করে দেখবেন। চশমা ছাড়া আজকাল কাছের জিনিস আর দেখাই যায় না। পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে না। মুখটাই কেবল উঁচিয়ে আছে জলের ওপর। আপ্রাণ চেষ্টা করছে জল ছেড়ে উঠে আসার।

দাদু ভাবলেন, কী রে বাবা! একবার জগদানন্দের বালিগঞ্জের বাড়িতে দোতলার বাথরুমের প্যান থেকে গোখরো সাপ ফোঁস করে উঠেছিল। জগদানন্দ ভিতু মানুষ। ভয়ে শাওয়ারের ডাণ্ডা ধরে পাক্কা পনেরো মিনিট ঝুলে ছিল। অবশ্য জগদানন্দ মনে করেছিল ঝুলে আছে। আসলে কিন্তু তা নয়। মাটিতেই তার পা দুটো ছিল। দেহের ভারে পাইপ বেঁকে ধনুকের মতো নীচে নেমে এসেছিল। সাপ, বিশেষ করে গোখরোর মতো রাজা-সাপ ভিতুদের ছোবল মারে না। একপাশে গোল হয়ে বসে জগদানন্দের নিশ্বাসের ফোঁসফোঁসানি শুনছিল। সাপ যেন কী একটা পারে না। হয় শুনতে, না হয় দেখতে। সে যাই হোক, জগদানন্দকে বাথরুম থেকে কিছুতেই বেরোতে না দেখে সকলের সন্দেহ হল, হার্ট অ্যাটাক নয় তো? বেশির ভাগ হার্ট অ্যাটাকই বাথরুমে হয়। দরজাও ভাঙা যাচ্ছে না। জগদানন্দ বাঁকা পাইপ ধরে দরজা ব্লক করে বসে আছে। বাইরে চেঁচামেচি শুনে অতি কষ্টে বললে, "বেঁচে আছি। কতক্ষণ থাকব জানি না। সাপ।" বাইরে থেকে সাহসীরা বললে, "সাপ তো কী হয়েছে, বেরিয়ে আসুন।" জগদানন্দ বেরোবে কী করে? বেরোবার পথ তো নিজেই বন্ধ করে বসে আছে। বাথরুমের কোণ থেকে দরজার মাথার ওপর দিয়ে শাওয়ারের পাইপ ছিল। সেই পাইপ এখন বেঁকে নীচে নেমে এসেছে। দরজা কোনও রকমে একটু খুলতে পারে। সে ফাঁক দিয়ে ভুঁড়ি গলবে না।

সেই জগদানন্দ আর বাথরুমে সাপের কথা ভেবে দাদু প্রথমটায় খুব ভয় পেয়েছিলেন।

তারপর ওকালতি বুদ্ধি খেলিয়ে বুঝতে পারলেন, ওটা সাপ নয়। সাপের সরু সরু গোঁফ থাকে না। তাহলে কী? সেপটিক ট্যাঙ্কে পোকা হয়। লাখ লাখ পোকা। সেই পোকা নয় তো? সর্বনাশ! লাখে লাখে সেই পোকা তেড়ে-মেরে বেরিয়ে আসতে চাইছে নাকি? আঁতকে উঠলেন। আর একবার ভাল করে ঝুঁকে দেখতেই মনে হল, চিনি গো চিনি, তুমি নেঙটি ইঁদুর। ভিজে বেড়ালের মতো চেহারা হয়েছে মানিক। মরতে ওখানে গিয়ে পড়লে কী করে? বেশ তো ছিলে আমার বইয়ের র‍্যাকে। যেখানে গিয়ে পড়েছ, সেখান থেকে তো আর উঠতে হবে না।

দাদু এক বালতি জল নিয়ে হুড় হুড় করে প্যানে ঢেলে দিলেন। চোখ বুজে প্রার্থনা করলেন, আমার মূল্যবান বইসমূহ কেটে কুঁচি কাটা করলেও ঈশ্বর এই নির্বোধ প্রাণীর আত্মার সদ্‌গতি করে দাও। আসচে বার ও যেন পণ্ডিত হয়ে জন্মায়। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দাদু বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এ আমি কী করে ফেললুম? আমার কী দরকার ছিল এক বালতি জল হুড় হুড় করে বাথরুমে ঢালার। পরোক্ষে আমিই হয়ে গেলুম ওই প্রাণীটির মৃত্যুর কারণ। একটা জীবন দিতে পারি না, একটা জীবন নিয়ে নিলুম। বিছানায় উঠে বসে আবার প্রার্থনা করলেন, "ঈশ্বর, এই নির্বোধ বৃদ্ধকে ক্ষমা করো প্রভু! ঝোঁকের বশে জল ঢেলে ফেলেছি। ও কি আর ওই গাড্ডা থেকে উঠতে পারত প্রভু? পারত না। তাই আমি জল দিয়ে ঢেইয়ে দিয়েছি। ওই অপবিত্র শরীরে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুই কি ভাল নয়? আমি নিজে যদি কখনও ম্যানহোলে পড়ে যাই, কথা দিচ্ছি, আমি বাঁচতে চাইব না। দমকলের লোককে গর্ত থেকে হেঁকে বলব, হোস দিয়ে আমাকে পদ্মার পাড়ে পাঠিয়ে দাও। সত্যি বলছি প্রভু। মিথ্যে নয়। তুমি আমাকে একবার ফেলেই দেখো।"

এত করেও দাদু শান্তি পেলেন না। ইশ, জলটা না ঢাললেই হত। আবার উঠলেন। বাথরুমে গিয়ে একবার দেখে আসি। মুখটা বেরিয়ে আছে না কি! বেরিয়ে থাকলে আর জল ঢালব না। ওর নিজের বরাতের ওপরেই ছেড়ে দোব। নাঃ, সে বরাত করিনি আমি। কোথায় কী? প্যানের গর্তে পরিষ্কার টলটলে জল। সেই ছুঁচলো মুখ অদৃশ্য। খুনের দায়েই পড়তে হল। মৃত্যুর পর ঈশ্বরের আদালতে বিচার হবে। এখানকার আদালতে আমি মানুষের বিচার করি। সেখানকার আদালতে আমার বিচার হবে। বেলিফ হেঁকে বলবে, আসামি হাজির।

ত্বক সুন্দর নির্মল, নববধূ সম উজ্জ্বল!

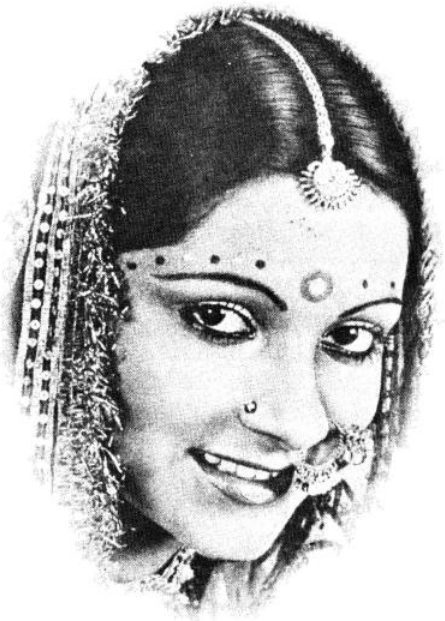

ক্লিয়ারাসিল ব্রণর মুখ খোলে, পরিষ্কার করে আর ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।

ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো অনেক রকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের উপদেশের জন্যে শুনুন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীরা ক্লিয়ারাসিলের উপকারীতা সম্বন্ধে কি বলেন। ক্লিয়ারাসিল...নিরাপদ আর সুবিধেজনক ওষুধ–যার বিশেষত্বই হ'ল আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা। এখন ক্লিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ পরিষ্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করছে।

অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া

শুধু ক্লিয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে।

১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়—ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ ফরমুলেশন ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।

২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়—ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য ক'রে, ফলে ক্ষতিকর-ভাবে টিপে বার করতে হয় না।

৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়—অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

কি ক'রে দেখুনঃ

- প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যেয় ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করুন।
- ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান। ব্রণর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান।
- ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে থাকুন কারণ ক্লিয়ারাসিল অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ রোধ করে।

মুখখানিতে ফুটে উঠলে স্নিগ্ধ লাবণ্য, জীবনের প্রতিপল মনে হবে ধন্য!

বিশ্বের "১" নম্বর ব্রণর ক্রীম

OBM 2115 R BN

বিষণ্ণ মনে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। অনুশোচনায় ঘুম এসে গেল। নাক ডেকে উঠল ফুড়ুত ফুড়ুত। এদিকে তলিয়ে যাওয়া ইঁদুর আবার ভেসে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টা করে উঠে এল ওপরে। অদম্য ইচ্ছা-শক্তি, বাঁচতে আমাকে হবেই। বুড়োর লাইব্রেরিতে এখন হাজার খানেক বই। একেবারে টাটকা। দাঁত পড়েনি একবারও। ওই বইয়েরই একটা পাতায় লেখা আছে, আয়ু অল্প, বহু বিঘ্ন, অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার, হাঁসের মতো জল থেকে দুধটুকু টেনে নিতে হবে। আমি ইঁদুর। আমার আয়ু ওদের চেয়ে আরো কম। আমার শত্রু অনেক। বেড়াল, কাক, পেঁচা, সাপ, ইঁদুরকল। ক'টা ইঁদুর আর স্বাভাবিকভাবে মরে! সবাই তো অপঘাতে শেষ হয়ে যায়। এই তো আমিই! এখুনি মরতে মরতে বেঁচে এলুম আমাদের ভগবানের জোরে।

ইঁদুরটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেই রাত বারোটা থেকে ক্রমান্বয়ে সাঁতার কেটে চলেছে। এখন প্রায় তিনটে। মানুষ হলে 'রেকর্ড করেছি, রেকর্ড করেছি' বলে গলায় পদক-টদক ঝুলিয়ে বসে থাকত। মরতে মরতে বেঁচে ফিরে আসার অ্যাডভেনচার কাহিনী লিখে ফেলত। সিনেমা হত। হীরো বনে যেত। ইঁদুরের সংবাদপত্রও নেই, সাংবাদিকও নেই। একমাত্র উল্লেখ আছে সেই কবির লেখায়: উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার।

ইঁদুরও ক্লান্ত হয়, ইঁদুরেরও ঘুম পায়। এখন একটু বিশ্রাম দরকার ভেবে বাথরুমের ভেতরেই ইঁদুরটা একটা শান্তির জায়গা খুঁজতে লাগল। ইঁদুর বলে কি মানুষ নয়? দাদু যে বালতি থেকে জল ঢেলেছিলেন, কলের তলায় সেই বালতিটা ইতিমধ্যে শুকিয়ে এসেছে। মানুষেরই মাথামোটা হয়, ইঁদুর বুদ্ধিমান হলেও কোনও কোনও ইঁদুর বেশ গবেট। একগুঁয়ে। গণ্ডার না হয়ে ইঁদুর হলে যা হয়। এই ইঁদুরটাও সেই রকম। ভেজা ইঁদুরও লাফাতে পারে। সেটা সহজেই বোঝা গেল। ইঁদুরটাও বুঝতে পারল। যখন সে তিড়িং করে লাফ মেরে ওই খালি বালতিটায় গিয়ে পড়ল। মূর্খ জানে না, বালতি বালতিই। বালতিটা খাট নয়। তার ওপর মাথার সামনেই কল। সেই কল আবার খোলা। খোলাই থাকে। ভোর ছ'টায় জল এলে কেউ উঠুক না উঠুক বালতি ভরে থাকবে। শিয়রে শমন রেখে মানুষ ঘুমোতে না পারলেও ইঁদুর ঘুমোতে পারে। 'বাঃ, কী সুন্দর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা প্ল্যাস্টিকের বাড়ি' বলে ইঁদুরটা এক পাশে শুয়ে পড়ল। মাথার ওপর বাথরুমের গোল আকাশ। আহা। ইঁদুরটার তখনও একটা সন্দেহ ছিল, ভিজে ইঁদুর কি কিছু কাটতে পারে! তা না হলে আর একটু লাফিয়ে বেসিনে উঠলে দাদুর পা পরিষ্কার করার স্পঞ্জটা পেত, একটা ছোবড়াও ছিল।

ইঁদুর ঘুমুলে মানুষের মতোই অসহায়। শেষ রাতে মানুষও গভীর ঘুমোয়, ইঁদুরও তাই। ছ'টার আগে ঘুম থেকে উঠলে ওই অবস্থা হত না। ঠিক ছ'টায় তেড়ে জল এল। ধোঁয়ার মতো। ইঁদুর নায়েগ্রাপ্রপাত দাঁতে কেটেছে হয়তো! তাতে তো আর ঠিক ধারণা হয় না জিনিসটা কী! পিরামিডও কাগজের মতো খেতে, নায়েগ্রাপ্রপাতও কাগজের মতো। তফাত, কোনওটা আর্ট প্রিন্ট, কোনওটা হোয়াইট প্রিন্ট। এখন বুঝল, নায়েগ্রা কাকে বলে। মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। একেই বলে ক্লাউড বার্স্ট। ছ' লিটার বন্যা। বালতির মাপ ছ' লিটার। ছ' লিটার জলে ইঁদুরের আবার হাবুডুবু। যেখানে জল পড়ছে সেখানে ঘূর্ণি। সেই আকর্ষণে বালতির কানা থেকে থাবা ছেড়ে যাবার মতো হচ্ছে। পেছনের পা দিয়ে সাঁতার কাটছে। সামনের হাত দুটো দিয়ে বালতির কানা ধরে আছে। তোড়ে জল পড়ছে। ইঁদুরেরও মৃত্যুভয় আছে। কান দুটো পেছনে খাড়া। চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে ঠেলে। চোঁচাঁ দৌড়লে মানুষের মুখ যে রকম সরু হয়ে যায়, এর মুখটাও তেমনি সরু দেখাচ্ছে।

সাড়ে ছ'টার সময় দাদুই প্রথমে বাথরুমে ঢুকলেন। বেসিনে চোখ-মুখ ধুলেন। হাত দিয়ে অ্যা অ্যা করে জিভ ছুললেন। এই শব্দটা শুনলেই বুঝতে হবে প্রভাত হল। পাখি ডাকে। দাদু অ্যা অ্যা করেন। কলটা বন্ধ করতে গিয়ে দাদুর নজরে পড়ল। বালতিতে এটা কী রে? অ্যাঁ, সেই ইঁদুর। লোম-টোম ভিজে ছাল ছাড়ানো অবস্থা। আরে ছি ছি। তুই ব্যাটা প্যান থেকে উঠে এসে ফের বালতিতে পড়েছিস! তোর দেখছি নির্ঘাত জলে ডোবার ফাঁড়া আছে! একেই বলে মানুষের ভাগ্য। আমারও ওই রকম পতাকী যোগ ছিল। মাদুলি পরে বেঁচে আছি। তোর কোষ্ঠীও নেই। বাপ-মাও

নিউট্রামূল! অন্যদের চেয়ে প্রায় ৪টাকা সস্তা!

কেন? কারণ, আমূলের সবচেয়ে সেরা জিনিষও অন্যদের চেয়ে সস্তায় পাওয়া যায়। 'আমূল' নামটি এমন পানীয়'র গ্যারাণ্টী দেয়—যা বেশী সুস্বাদু, বেশী মালাইদার, বেশী পুষ্টিকর হবেই! আর তেমনি সাশ্রয়কারীও! আপনার সারা পরিবারকে নিউট্রামূল খাওয়ান। এই উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যবর্ধক পানীয়···আপনার পয়সাও বাঁচায়! আজই হয়ে যান "নিউট্রামূল দাদা"!

নিউট্রামূলের মত অন্য পানীয়র সঙ্গে দামের তুলনা (টাকা)*

	৫০০গ্রাঃ	৮০০গ্রাঃ	১০০০গ্রাঃ
নিউট্রামূল	১৩.৮৩	—	২৬.৬৭
মাল্টোডা	১৭.৫৮	—	—
বোর্ণভিটা	১৭.৬৮	২৬.৯৭	—
বুস্ট	১৮.৮৭	—	—

*মার্চ ১৯৮১-র সর্বাধিক গ্রাহক-মূল্য। স্থানীয় কর আলাদা

এখন ১০০০ গ্রামেতে

বাজারে ছেড়েছেন :
গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড
আনন্দ, গুজরাট।

daCunha-GCM-45 B

নেই। এতবড় এই বিরাট, বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে এইটুকু একটা শরীর নিয়ে বাঁচা যায়? তার ওপর অত্যাচারী। কেউ ভাল চোখে যে দেখবে, সে-পথও রাখনি!

ইঁদুরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দাদুর মনে হল, সেই গল্পটা কত সত্যি। জলে ডোবা মানুষকে উদ্ধারের চেষ্টা না করে তীরে দাঁড়িয়ে তিরস্কার করা। উদ্ধারের কথা মনে হতেই দাদুর আবার ভীষণ ঘেন্না এসে গেল। ইশ, প্যান থেকে এসে মুখ ধোবার জলের বালতিতে পড়েছে। উত্তেজিত হলেই দাদুর ভাষা, ভাবনা সব হিন্দিতে চলে যায়। ইসকো হাটাও, আভি হাটাও, সব বাহারমে ফেক দেও। রামখেলোয়ান, রামখেলোয়ান।

দাদু বাথরুমের দরজা খুলে নটরাজের মতো নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলেন। সামনেই রামখেলোয়ান। হাতে তোয়ালে। ভেবেছিল, বুড়াবাবু হয়তো তোয়ালে চাইছেন। দাদু বালতিটা দেখিয়ে বললেন, বিলকুল বাহার ফেকো।

দরজা পেরোলেই বাগান। দাদুর কথা শেষ হওয়া মাত্রই রামখেলোয়ান পালোয়ানি শরীর নিয়ে এক ঝটকায় বালতিটা তুলে বাইরের বাগানে জলটা ফেলে দিল। পরিষ্কার তকতকে কচ্ছপের পিঠের মতো মাটি। চারপাশে জল গড়িয়ে গেল। রামখেলোয়ান জল ফেলে লাল বালতিটা করবী গাছের তলায় রাখতেই দাদুর খেয়াল হল, আরে বাইরে তো কাক আছে, ওই তো পাঁচিলে বসে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, "কাঁহা ফেকা?"

রাম বললে, "বাহারমে ফেকিয়ে দিয়েছি, যেমুন বলিয়েছেন।"

"আরে মূর্খ, উসমে এক চুহা থা। কৌয়া লে যায়েগা। সর্বনাশ হো গিয়া।"

দু'জনেই ঊর্ধ্বশ্বাসে বাইরে ছুটলেন। রামখেলোয়ান বললে, "আপ য্যায়সা বোলা।"

দাদু খুব রেগে বললেন, "হাম মূর্খ হ্যায় তো তোম গোমূর্খ হোগা।"

পরিষ্কার মাটি। ঘাসটাস, ঝোপঝাপ কিছুই নেই। জল পড়ে ভিজে ভিজে মাটি। ইঁদুরের চিহ্ন নেই। তিনটে কাক একটু আগে পাঁচিলে বসে ছিল। কাক তিনটে আর নেই। দাদু হায় হায় করে উঠলেন। "তোর জন্যেই প্রাণীটা বেঁচেও বাঁচল না। জলে ডোবা থেকে যদিও বা বাঁচল, কাকে নিয়ে গেল। পাষণ্ড, আভি নিকালো। তোমকো হাম নেহি মাঙতা।"

রামখেলোয়ান মুখ কাঁচুমাচু করে বাইরের রকে গিয়ে বসে রইল। দাদু নিজেই বাগানটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কোথাও নেই। আবার আমি। আমিই একটা প্রাণীর এতক্ষণের জীবন-সংগ্রাম শেষ করে দিলুম। আমি এক যমদূত। হে প্রভু, আমি যদি জলে ডবি, তাহলে আমাকে কেউ যেন এইভাবেই তুলে বাঘের মুখে ফেলে দেয়। আমি তোমাকে স্ট্যাম্প-পেপারে লিখে দিয়ে যাব। আমার ওই সাজাই হওয়া উচিত।

দাদু উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাগান থেকে বাড়ি ঢুকলেন। খুব মন খারাপ। পা ধুয়ে তোয়ালেতে পা মুছলেন। পাশেই বিদ্যাসাগরী চটি। প্রথমে বাঁ পা ঢোকালেন। তারপর ডান পা'টা ভাল করে মুছে জুতোতে ঢোকালেন। ডগার দিকে নরম-মতো কী একটা নড়ে উঠল। শুধু নড়লই না। চিঁ করে আওয়াজ করে উঠল। পা বের করে উলটে-পালটে পা'টাকেই ভাল করে দেখলেন। মানুষের পা তো চিঁচিঁ করে ডাকে না। তবে কি জুতো ডাকছে? জুতোর সামনে থেবড়ে বসে পড়লেন। সেই ইঁদুর। জুতোর ভেতর ঢুকে গুটিসুটি মেরে বসে আছে।

"রামখেলোয়ান, এই রামখেলোয়ান।" বাজখাঁই চিৎকার। একটু আগেই যার চাকরি গিয়েছিল, সে দৌড়ে এল। সারাদিনে বেচারার মিনিটে মিনিটে চাকরি যায়, আবার হয়। দাদুর নির্দেশে সে সাবধানে চটিটা তুলে নিল। দাদু বললেন, "সামালকে, উসকা ভিতর সেই বীর চুহা হ্যায়। চলো।"

"কাঁহা চলেগা বড়া সাব।"

"তোমহারা ঘরমে" বাইরের দিকে রামের ঘর, সেই ঘরে জুতোসুদ্ধু ইঁদুর থাকবে। একদম ডিসটার্ব করা চলবে না। সন্ধের দিকে সুস্থ হয়ে নিজেই চলে আসবে দাদুর লাইব্রেরিতে।

সামনে রামখেলোয়ান চলেছে জুতো হাতে। ভেতরে ভিজে ইঁদুর। পেছনে দাদু চলেছেন পাহারাদার। বলা যায় না, রাম যদি ফেলে দেয়। রাম বললে, "এ চিজ কাঁহাসে আয়া জি?"

দাদু গম্ভীর গলায় বললেন, "মুলুকসে।"

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আগের কথা : **শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। প্রয়াগ নামে যে-লোকটি আগে শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, পরে বেপাত্তা, তার আসল পরিচয় কী? ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সেখানে সিংহিবাবুর খবর পায়। পথে তার উপরে হামলা চলে। সিংহিবাবু বলছেন, তিনি শত্রু নন, বন্ধু। প্রয়াগ কি শিশিরের খাবারের সঙ্গে কোনও ওষুধ মেশাত? তারপর...**

॥ ১৯ ॥

পরের দিন বংশীর দোকানে পা দিয়েই শিশির বলল, "নাও, এবার ঠেলা বোঝো; তোমার হেমবাবু সিংহিমশাইকে খেপিয়ে দিয়েছে।"

বংশী কিছুই বুঝতে পারল না। বলল, "কেন? আবার কী নতুন কাণ্ড ঘটল?"

শিশির বসল। বলল, "দাও তোমার নস্যির ডিবেটা দাও। বর্ষার চোটে সর্দি হয়ে গিয়েছে। মাথা ভার।"

বংশী নস্যির ডিবে বাড়িয়ে দিল। শিশির আঙুলের ডগায় নস্যি নিয়ে জোরে টান মারল। তারপর হাঁচতে লাগল।

বার পাঁচ-সাত জোরে-জোরে হেঁচে নাক মুখ পরিষ্কার করল। চোখ ছলছল করছে। বলল, "কাল ওই বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে রাত্তির বেলায় এক ফাঁকে সিংহিবাবু হাজির। তিনি যা বললেন তাতে আমার মাথা ঘুরে গেল।"

শিশির একে একে সব কথা বলল বংশীকে।

বংশী কেমন বোকা হয়ে গেল। মাথা চুলকে বলল, "হেমবাবু অত কাঁচা পুলিশ নন। আমি বিশ্বাস করি না। সিংহিবাবু যতটা চালাক হেমবাবু তার চেয়ে কম নয়। আমার মনে হয়, হেমবাবু কোনো প্যাঁচ খেলে এসেছেন। পরে গিয়ে জেনে নেব। কিন্তু পরের ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলছে যে।" বলে বংশী নিজের মাথায় গোটা কয়েক গাঁট্টা মারল।

দোকানে খদ্দের এসেছিল। কাগজে লেখা ফিরিস্তি নিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে।

বংশী ফিরিস্তি মিলিয়ে টুথপেস্ট,চা, জুতোর কালি, টর্চের ব্যাটারি আরও কত রকম খুচরো জিনিস দিতে লাগল।

শিশির রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। কাল রাত্রে তার ঘুম হয়নি ভাল করে। কত রকম কী ভেবেছে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে লোকটাকে দিয়ে দিল বংশী। হিসেব করল। প্রায় তেইশ টাকা।

জিনিস নিতে যে এসেছিল সে কাজের লোক। বাড়ি থেকে চিরকুট নিয়ে এসেছে। ফতুয়ার পকেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বার করে এগিয়ে দিল।

বংশীর কাছে ভাঙানি ছিল না। এত সকালে পঞ্চাশ টাকার ভাঙানি থাকবেই বা কেমন করে।

বংশী বলল, "রেজকি নেই। মিষ্টির দোকান থেকে ভাঙিয়ে আনো। যাও, আমার নাম করে বলো, ভাঙিয়ে দেবে।"

লোকটা টাকা ভাঙাতে চলে গেল।

বংশী আর-একবার হিসেবটা দেখে নিচ্ছিল। দেখে নিয়ে কাগজটা উলটে রেখে দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, শিশির হঠাৎ বলল, "সিংহিবাবুর একটা কথা আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে।"

তাকাল বংশী।

"আমায় কেউ কোনো রকম একটা খারাপ ওষুধ খাওয়াচ্ছিল লুকিয়ে। আর সেটা প্রয়াগ।"

বংশী বলল, "সে তুমি বুঝতে পারবে। তোমার অসুখের প্রথম থেকে ভাল করে ভেবে দেখলেই ধরতে পারবে।"

"ভেবে দেখেছি। প্রথম যখন অসুখ করে প্রয়াগ ছিল না। তা সে তো করতেই পারে অসুখ। কিন্তু অসুখ থেকে সেরে ওঠার মুখে প্রয়াগ আমাদের বাড়িতে আসে। তখন থেকে

যাচ্ছেতাই কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। তারপর প্রয়াগ যখন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, শরীরও ভাল হতে লাগল। অবশ্য প্রয়াগ যাবার পরও হয়েছে। তবে কম। শেষ পর্যন্ত সেরে গেল। এটাকে তুমি কাকতালীয় ব্যাপার বলবে?"

বংশী বলল, "না; তবে প্রয়াগ যাবার পরও তোমার অসুখ ছিল বলছ। সেটা কেমন করে হবে?"

শিশির বলল, "আমি ভেবেছি। ওষুধের আফটার এফেক্ট বলতে পারতাম। তা বলছি না। কারণ ওই ওষুধের গুণ যদি চব্বিশ ঘণ্টারই হত, আমি সকালের দিকে ভাল আর সন্ধের পর খারাপ থাকতাম না। আমার মনে হয়, ওষুধের গুণ পাঁচ-সাত ঘণ্টা কি বড় জোর আর-একটু বেশি থাকত। বিকেলের গোড়ায় ওষুধ পড়ত পেটে—সন্ধেতে তার অ্যাকশান সব চেয়ে বেশি হত। আবার ধীরে ধীরে সেটা কেটে যেত। সকালে ভাল থাকতাম।" বলে শিশির একটু থামল, বলল, "কাজেই ওই ওষুধ খাবার জের হিসেবে প্রয়াগ চলে যাবার পরও ভুগেছি ক'দিন—তা আমার মনে হয় না।"

"কী মনে হয় তোমার?"

শিশির বলল, "মনে তো একরকমই হতে পারে। প্রয়াগ চলে যাবার পরও কেউ দিন কয়েক ওষুধটা খাইয়েছে। কিন্তু কে? আমাদের বাড়িতে সন্দেহ করার মতন কেউ নেই। প্রয়াগ ছাড়া সবই পুরনো লোকজন। তারা কখনো এ-কাজ করবে না।"

বংশী শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল।

শিশির বলল, "সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সিংহিবাবু আরও জটিল করে দিলেন ব্যাপারটা।"

টাকা ভাঙিয়ে ফিরে এল লোকটা।

বংশী তার পাওনা টাকা-পয়সা নিল। জিনিসপত্রগুলো বড় ঠোঙায় ভরে রেখেছিল কিছু, কিছু ছিল খুচরো। এগিয়ে দিল।

লোকটার কাঁধে গামছা ছিল। বেঁধে নিল ভাল করে।

সওদা নিয়ে চলে গেল লোকটা।

বংশীর হঠাৎ খেয়াল হল, চিরকুট ফেলেই চলে গিয়েছে ও। চিরকুটে হিসেব লেখা আছে। তা ছাড়া বাড়িতে যদি মালপত্র মিলিয়ে নিতে চায়—চিরকুটটা দরকার।

শিশির বলল, "ব্যাপারটা কী?"

"টেলিগ্রাম।"

"কাগজটা ফেলে গেল—! দাঁড়াও দেখি লোকটাকে—।" বংশী চিরকুটটা হাতে করে বাইরে গেল দোকানের। তারপর হাঁক পেড়ে হাত নেড়ে ডাকতে লাগল লোকটাকে।

চিরকুট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বংশী অন্যমনস্কভাবে আবার একবার কাগজটা দেখল।

ততক্ষণে ফিরে এসেছে লোকটা। সে নিজেই হাত বাড়াল।

বংশী হঠাৎ কেমন থ' হয়ে দাঁড়িয়ে একবার কাগজটা উলটে-পালটে দেখল, তারপর লোকটাকে। শেষে কাগজটা ফেরত দিয়ে দিল তাকে।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল লোকটাকে, তারপর যেন লাফ মেরে দোকানে ফিরে এল। "শিশির?"

শিশির বংশীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

বংশী যেন উত্তেজিত। বলল, "হ্যাঁ, আর-একটু আগে যদি নজরে পড়ত!" বলে কপাল চাপড়াল।

নতুন

প্রস্তুত হ'ল

প্রেস্টীজ

১০০% সুরক্ষিত

Patent pending

এক অতি অপূর্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' দ্বারা সর্বাধিক সুরক্ষা-পূর্ণ প্রেসার কুকার।

যখন খাদ্য-কণা ওয়েট ভাল্বকে বন্ধ ক'রে দেয় তখন কুকারের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রেসার সৃষ্টি হয়। সেইসময় আপনার সুরক্ষা নির্ভর করে কেবলমাত্র সেফটি প্লাগ-এর উপর। কিন্তু আপনি কি ঠিক চিনতে পারবেন-কোনটি আসল বা কোনটি নকল? যদি প্লাগটি নকল হয় তার ফলে কি ঘটতে পারে তা-ও আপনি জানেন না।

তাই, পূর্ণ সুরক্ষা-র বিশেষ প্রশ্নটি চিন্তাধারায় রেখে-ই আমরা তৈরী করলাম এই নতুন প্রেস্টিজ! এর অপূর্ব্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' আপনার প্রেসার কুকারকে যে কোনো অবস্থায় নিশ্চিন্তভাবে সুরক্ষিত রাখবে; সেফটি প্লাগ-টি হ'য়ে যাবে অপ্রয়োজনীয়।

অপূর্ব্ব 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম'—কিভাবে নতুন প্রেস্টীজ-কে ১০০% সুরক্ষা করে

সেফটি প্লাগ উড়ে যাওয়ার অনেক আগেই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' অনাবশ্যক ভাপ-কে ধীরে ধীরে সুরক্ষার সঙ্গে বার করে দেয়। কুকারের বিভিন্ন 'পার্টস' নকল বা পুরানো হলেও নির্ভরযোগ্য এই 'গাসকেট রিলিজ সিস্টেম' ঠিকমত কাজ চালিয়ে যায় —সদাসর্বদা!

নতুন প্রেস্টীজ অধিক সুবিধাজনক

গাসকেট দ্বারা ভাপ বেরিয়ে আসার পর গাসকেট-টিকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিন; মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপনার কুকার আবার কাজে প্রস্তুত!

সেফটি প্লাগ-এর আর প্রয়োজনীয়তা নেই—তাই এটিকে বারবার বদলান-র ঝঞ্ঝাট বা নকল-এর চিন্তা থাকল না।

নতুন প্রেস্টীজ অনেক বেশী টেকসই

অনাবশ্যক ভাপ-চাপকে বিপদ সীমা-য় পৌঁছাতে দেওয়া হয় না; তাই কুকারের সাধারণ টুট-ফুট অনেক কম। অতএব, নতুন প্রেস্টীজ, অবশ্যই অন্য কুকারের তুলনায় টেকসই।

নতুন প্রেস্টীজ-এর অন্যান্য লাভ

* অধিক টেকসই মোটা 'তল'
* স্টেনলেস স্টিল-এর নতুন স্ক্রু সমেত মজবুত হ্যাণ্ডেল
* মজবুতভাবে ধরা-র জায়গা সমেত 'অকৃজিলিয়ারী হ্যাণ্ডেল—যা গরম হয়ে যায় না
* দৃঢ় আর মজবুত নতুন 'টিবেট'
* আকর্ষক ঝকঝকে চেহারা
* উপযুক্ত রন্ধন-পুস্তিকা
* ছয়টি সুবিধাজনক সাইজ-এ পাওয়া যায়।
* ১০ বছরের গ্যারান্টী

আর, গত ৩০ বছরে ভারতে সর্ব্বাধিক লোকপ্রিয় প্রেসার কুকার 'প্রেস্টীজ'-এর বৈশিষ্ট্য।

tk উৎপাদন

Prestige

যারা ভারতে প্রথম প্রেসার কুকার প্রস্তুত করেছে

maa TTP 2 Ben c 81

"টেলিগ্রাম! মানে?"

"ওই লোকটা কোন্ কাগজে ফর্দ লিখিয়ে এনেছিল জানো? টেলিগ্রাম ফর্মের কাগজে। পোস্ট অফিসের ফর্ম। আধখানা ছিঁড়ে তার পেছনে বাড়ির লোকে ফর্দ লিখে দিয়েছে।"

শিশির তখনও যেন ধরতে পারছিল না কথাটা। বলল, "তাতে কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে?...আরে, তুমি বুঝতে পারছ না—টেলিগ্রাম ফর্ম বাড়িতে যাবে কেন?"

বংশী কথাটা গুছিয়ে বলতে না পারলেও শিশির এবার বুঝে ফেলল ব্যাপারটা। লোকের বাড়িতে অকারণে টেলিগ্রাম ফর্ম থাকে না। বংশী সন্দেহ করছে কিছু।

শিশির বলল, "তুমি তো অদ্ভুত কথা বলছ?"

"কেন?"

"বাড়িতে কেউ টেলিগ্রাম ফর্ম রাখতে পারবে না? হয়তো কোনো দরকারে নিয়েছিল। দু-একটা ফর্ম বাড়িতে থাকতেই পারে। কাজে লাগেনি...পড়ে ছিল, ছুটকো কাগজ, কেউ ছিঁড়ে বাজারের ফর্দ লিখেছে।"

বংশী বলল, "বাড়িতে টেলিগ্রাম ফর্ম রেখে দেয়—এমন মানুষ এখানে কম। দু-চার জন বিজনেসম্যান রাখতে পারে। এমনি লোক রাখবে কেন। যখন দরকার পড়বে পোস্ট অফিসে গিয়ে ফর্ম নেবে।"

"তুমি চেনো ওই লোকটাকে? কোন্ বাড়িতে কাজ করে জানো?"

"লোকটাকে মুখে চিনি। ও কাজ করে যে-বাড়িতে সেটা লাইনের ও-পারে—। বাড়িটা সামান্য দূরে। একেবারে ফাঁকায় বলতে পারো। বাড়িটা যাঁর ছিল তিনি বেচে দিয়েছেন। অন্য লোক কিনেছে।"

"নাম কী?"

"ভবতোষ সান্যাল।"

"একলা থাকেন?"

"না, পরিবারের লোকজন আছে। স্ত্রী মা, এক বোন।"

"চেনো তুমি?"

"ওই মুখ চেনা। আমার দোকান থেকে জিনিসপত্র কেনেন কিছু-কিছু।"

"কী করেন ভদ্রলোক?"

"তা তো ভাই আমি ঠিক জানি না। তবে ভদ্রলোক আজ বছর-খানেকের ওপর আছেন। একটা চোখ শুনেছি অন্ধ। কলকাতার লোক ওঁরা।"

শিশির সন্দেহের তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না। এক ভদ্রলোকের বাড়িতে যদি দুটো টেলিগ্রাম ফর্ম থাকে, আর সেটা ব্যবহার না হওয়ার দরুন বাড়ির লোক যদি তাতে ফর্দ লিখেই ফেলে তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।

শিশিরের হাসি পেল। বলল, "বংশী, আমরা একেবারে ঝানু গোয়েন্দা হয়ে যাচ্ছি।! সব ব্যাপারেই সন্দেহ।"

বংশী বলল, "তুমি ঠাট্টা করছ?"

"না। তবে টেলিগ্রাম ফর্মের ব্যাপারটা আমাকে তেমন নাচাচ্ছে না।"

"তুমি অন্য জিনিস ভাবছ। কলকাতার কথা।"

"তা ভাবছি।"

"ভাবছ, তোমার বাড়িতে এমন কে থাকতে পারে যে তোমায় প্রয়াগের চেলা হয়ে ওষুধ খাওয়াতে পারে? তাই না?"

"ঠিক ধরেছ। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। বিশ্বাসও করছি না।"

বংশী বলল, "আমি ভাই একটা কথা তোমায় স্পষ্ট বলে দিচ্ছি। সিংহিবাবু তোমাকে যাই বলুন, আমি তাঁকে সন্দেহ করি। মুখে বন্ধু বললেই বন্ধু হয় না। যদি বন্ধুই হবেন—কেন খোলাখুলি সব বলছেন না?"

শিশির কোনো জবাব দিল না।

বংশী নিজেই আবার বলল, "তুমি মনে কোরো না, হেমবাবু ওই সিংহির ভড়কিতে ভুলবেন। আজ হোক কাল হোক হাঁড়ির খবর ঠিক টেনে বার করবেন উনি।"

"দেখা যাক।"

"আর টেলিগ্রামের ব্যাপারটা তুমি উড়িয়ে দিচ্ছ। আমি দিচ্ছি না।"

"কী করবে?"

"ভেবে দেখি। অন্তত পোস্ট অফিসে গিয়ে একবার খোঁজ করব— দেখি, ভবতোষবাবুর বাড়ি থেকে কোনো লোক এসে ফর্ম নিয়ে গিয়েছে কিনা। বা ও-বাড়ির কেউ সেই দিন টেলিগ্রাম করতে এসেছিল কি না—যেদিন তোমাদের বাড়িতে টেলিগ্রাম করা হয়।"

শিশির চুপ করে থাকল। (ক্রমশ)

ছবি সুনীল শীল

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

॥ ৩২ ॥

স্কুল-কলেজ ফাঁকি দিয়ে সভা-সমিতিতে যাওয়া সাধারণত বাবা-মা পছন্দ করতেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া উডবার্ন পার্কের বাড়িতে যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বিরাজ করত, ছাত্রজীবনে হুজুগে মেতে যাওয়া তার সঙ্গে ঠিক খাপ খেত না। তবে এ-সবই সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থার কথা। অনেকগুলো ব্যতিক্রম তো আমার জীবনেই ঘটেছে। স্কুলজীবনেই তো আইন অমান্য আন্দোলনের সময় রাস্তায় বেরিয়েছি। বাবা তখন জেলে, মা তো সব জেনেও কিছু বলেননি বা সোজাসুজি বারণও করেননি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বার সময় ১৯৩৭সালে আমরা একটা বড়রকমের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম—আন্দামান থেকে আমাদের বিপ্লবী বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনবার দাবিতে। বাবা তখন বাঙলার আইনসভায় বিরোধীপক্ষের নেতা। বাবারই নেতৃত্বে টাউন-হলে বিরাট প্রতিবাদ-সভা হবে। সব স্কুল-কলেজে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। কলেজগুলোর মধ্যে রাজভক্তদের দুটো শক্ত ঘাঁটি ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স ও প্রেসিডেন্সি। এই দুই কলেজের কর্তৃপক্ষ যেমন ভিন্নমতাবলম্বী ছিলেন, ছাত্রদের বড় একটা অংশও ছিল রাজভক্তদের দলে ও জাতীয় আন্দোলনে অনাগ্রহী। সুতরাং ঐ দুই কলেজে ধর্মঘট সফল করবার জন্য আমরা উঠেপড়ে লাগলাম। সেই সময় একটা বড় সুবিধা ছিল যে ছাত্রদের সংগঠন ছিল একটাই এবং ঐক্যবদ্ধ। অনেক তাত্ত্বিক বিষয়ে আমাদের মতামত ভিন্ন হলেও, যে-কোনো জাতীয় প্রশ্নে আমরা সকলে মিলে উঠেপড়ে লাগতাম।

সেন্ট জেভিয়ার্সে ধর্মঘট সফল হল এবং আমরা মিছিল করে প্রেসিডেন্সিতে গেলাম। আমাদের হানায় প্রেসিডেন্সির দরজাও খুলে গেল। অন্য কলেজের সব ছাত্র তো ছিলই। ছাত্রদের একটা বিরাট মিছিল স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে ঘুরে টাউন-হলে যাবার চেষ্টা করল। স্ট্র্যাণ্ড রোডে ঘোড়সওয়ার এক বড় পুলিশের দল ঘোড়া ছুটিয়ে ভীষণ ভাবে বেটন চার্জ করল। আমরা যারা সামনের দিকে ছিলাম, স্ট্র্যাণ্ড রোডের লোহার রেলিং-এ নিজেদের সেঁটে রেখে কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচালাম। যাঁরা মাঝামাঝি ছিলেন তাঁদের খুব আঘাত লাগল, আবার অনেককে পুলিশ টেনে টেনে ভ্যানে তুলল। সন্ধ্যার পর পুলিশের চোখ এড়িয়ে টাউনহলে হাজির হলাম। বাবাকে সভায় দূর থেকে দেখলাম। বেশি রাতে হেঁটে বাড়ি ফিরে যা হয়েছিল বাবাকে বললাম। শান্তভাবে শুনে মুচকে হেসে শুতে যেতে বললেন।

মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তখন পর্যন্ত বাইরেকার কোনোরকম আন্দোলন থেকে দূরেই থাকত। মেডিকেলে ভর্তি হবার পর দেখলাম যে, সেখানে একটি নতুন অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। সে-সময়ে বাংলায় মুসলিম লীগের রাজত্ব। সরকারের প্ররোচনায় ছাত্রসম্পদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমন-কী ছাত্র ইউনিয়নের আইনকানুনেও ভাগাভাগির নীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া মিলিটারি থেকে মনোনীত কিছু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছাত্র মেডিকেল কলেজে পড়তে আসত—নাম ছিল মিলিটারি মেডিকেলস্। ফলে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের বেশ অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হত। ব্যক্তিগতভাবে আমার একটা সুবিধা ছিল। বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চরিত্র এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের সুনাম অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্রদের বিশ্বাস ও সমর্থন লাভ করতে আমাকে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া সব সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে আমরাও বাবা ও রাঙাকাকাবাবুর উদার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে চেষ্টা করতাম। ফলে, প্রথমে ছাত্র ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি

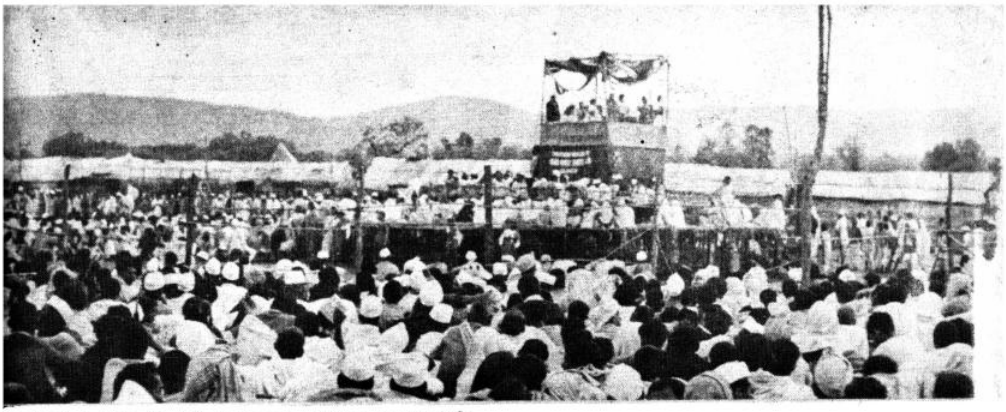

রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলন। লেখকের তোলা ছবি

ও পরে সভাপতি নির্বাচনে আমি সব দিক থেকেই সমর্থন পেয়েছিলাম।

১৯৩৬ সালে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে কার্শিয়ং-এ থাকার সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা প্রত্যক্ষভাবে আমাকে প্রভাবিত করতে আরম্ভ করে। সেই সময় অবশ্য অন্য অনেকের মতো সবরকমের রাজনৈতিক বই, কাগজপত্র আমি পড়তাম। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ও দলের কার্যকলাপও আমি বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতাম। মনে আছে, সেই সময় কিছুদিনের জন্য মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা আমার উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল। সবকিছু দেখেশুনে বিচার করে একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মতামত গড়ে তুলতে সময় লাগে। নানারকম লেখা পড়ে ও আলোচনা শুনে অপরিণত বয়সে আমি কখনও কখনও রাঙাকাকাবাবুর মত ও পথ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হয়েছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গভীর চিন্তা ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পর সব দ্বিধা ও সংশয় কেটে গেছে। আজও তো দেখি অনেকেই —তাদের মধ্যে বাঙালি ছাত্র ও যুবার সংখ্যা কম নয়—রাঙাকাকাবাবুর আদর্শ পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি এবং তাঁর কার্যাবলীর যথেষ্ট মর্যাদা দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। আমি তখন সবেমাত্র ম্যাট্রিক পাস করেছি। বাড়ির একজন রাঙাকাকাবাবুকে বললেন, আমি অন্য কোনো রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। রাঙাকাকাবাবু আমার দিকে চেয়ে মুচকে হেসে বললেন, তাতে কী হয়েছে, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন নিজের পরিণত বয়সে দেখছি,—অন্য অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু সব ঠিক হয়ে যায়নি।

১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হবার পর একদিন রাঙাকাকাবাবু আমাকে ডেকে বললেন, আমি যেন নিয়মিত মস্কো রেডিও থেকে প্রচারিত খবরাখবর শুনি। যদি কখনও আমাদের দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে, বিশেষ করে তাঁর নিজের কার্যকলাপ সম্বন্ধে, তারা কিছু বলে তাহলে আমি যেন নোট করে রাখি। উডবার্ন পার্কে একটা ভাল রেডিও ছিল, তাতে দূরদেশের প্রোগ্রাম ভাল শোনা যেত। আমি তো রাত জেগে ক্রমাগতই শুনতে লাগলাম। বেশি রাতে বাবা যখন কাজ সেরে উপরে উঠতেন, প্রায়ই দেখতেন যে, রেডিও বেজে চলেছে আর আমি হয়তো রেডিওতে মাথা ঠেকিয়ে ঘুমিয়ে আছি। আমাকে তুলে দিয়ে হেসে বলতেন, এই রে, সুভাষের পাল্লায় পড়েছে! অনেক শুনেও আমি রাঙাকাকাবাবুকে বিশেষ কোনো খবর দিতে পারিনি। কারণ মস্কোরেডিও প্রধানত তাদের নিজেদের খবরই প্রচার করত, আর ক্রমাগতই স্টালিনের মহিমাকীর্তন শুনতে হত। রাঙাকাকাবাবু কেন আমাকে এ-কাজটি দিয়েছিলেন আমি জানি না। তবে আমার দিক থেকে একটা বড় লাভ হল যে নানা দেশের খবরাখবরে আমার বেশ একটা উৎসাহের ভাব জাগল ও বিদেশী রেডিও শোনার অভ্যাসটা স্থায়ী হয়ে দাঁড়াল।

কংগ্রেসের সভাপতিপদ থেকে ইস্তফা দেবার পর থেকে রাঙাকাকাবাবু ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনোরকম আপসের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলেন যে, ১৯৪০-এর মার্চ মাসে যখন বিহারের রামগড়ে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন হবে সেই সময় পাশেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে তিনি আপসবিরোধী সম্মেলন ডাকবেন। বিহারের

স্বাস্থ্য ঝলমল,
প্রাণে খুশী উচ্ছল

OBM 6617 BN

মজাদার বোর্নভিটা আপনার পরিবারকেও দিন।
স্বাদেভরা বোর্নভিটা, কোকো, মল্ট, দুধ আর
চিনির গুণে ভরপুর।

এবার! বড়রকম সঞ্চয়, পুরো এক টাকার
রিফিল প্যাকের সঙ্গে

ক্যাডবেরিস্

বোর্নভিটা

আপনাদের জন্যে গুণে ভরপুর

কৃষকনেতা স্বামী সহজানন্দ ঐ সম্মেলন সংগঠনের ভার নিলেন। আমার খুব ইচ্ছা হল অন্তত একদিনের জন্য রামগড়ে যাই। মেডিকেল কলেজে তখন খুব কাজ। যাই হোক, মাকে চুপিচুপি বলে রেলভাড়া নিয়ে তো রাত্রের ট্রেনে রওনা দিলাম। সকালে রামগড়ে পৌঁছে দেখলাম ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে সবকিছু তছনছ হয়ে গেছে। বাইরেও জল, প্রতিনিধিদের ক্যাম্পেও। রাঙাকাকাবাবুর ক্যাম্পে গিয়ে দেখি, পরিবেশ কর্দমাক্ত। তারই মধ্যে তিনি একটা চারপাইতে বসে কাগজপত্র দেখছেন। শুনলাম সবেমাত্র সব ক্যাম্প ঘুরে কে কেমন আছে দেখে, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে নিজের ঘরে ফিরেছেন। আমাকে দেখে গম্ভীরভাবে বললেন, কী, রাতটা থাকা হবে নাকি? আমি আমতা-আমতা করে বললাম, না, রাত্রের ট্রেনে ফিরে যাব, কলেজ চলছে তো। 'হুঁ' বলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থার যা অবশিষ্ট আছে আমাকে জানালেন। আমার মনে হল, আমি রামগড়ে যে গেছি তাতে তিনি খুশি, কিন্তু কেবল একদিনের জন্য যাওয়াটা তাঁর পছন্দ হয়নি।

পাশেই কংগ্রেসের অধিবেশন। হাতে কিছু সময় আছে দেখে কংগ্রেসের এলাকায় গেলাম। কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন যেখানে হবার কথা সেটা ছিল বিরাট গোলাকার নিচু জমি, জল জমে সেটা একটা পুকুরে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং সেখানে সভা হতে পারেনি। খানিকটা দূরে উঁচু জায়গায় একটা বড় গাছের তলায় মঞ্চ তৈরি করে সভা চলছিল। মৌলানা আজাদ বক্তৃতা করছিলেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুন কংগ্রেস তো ঠিকমতো হতেই পারল না। সংক্ষেপ করে সেই দুপুরেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে মেঘ কেটে গেল। বিকেলে যখন আপসবিরোধী সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশন বসবে তখন বেশ সূর্যের আলো। বেশ জমজমাট সভা হল। আমি অভ্যাসমতো বেশ কিছু ছবি তুললাম।

আপসবিরোধী সম্মেলনের কর্মসূচী অনুযায়ী এপ্রিল মাসে জাতীয় সপ্তাহে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন শুরু হল। সারা দেশে সুভায-অনুগামীদের ব্যাপক ধরপাকড় চলতে লাগল। তাঁর নিজের কী হবে আমাদের তখন তাই চিন্তা।

(ক্রমশ)

ছবির মজা

পাঁচটা পাখি ও একটা বেড়াল এই ছবিতে লুকিয়ে আছে। খুঁজে বার করো।

ফুটকিগুলোকে পরপর জুড়ে দিলেই চমৎকার একটা পাখি পেয়ে যাবে।

মেখলিগঞ্জে একরাত্রি

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনহাটা ছাড়তেই বেশ সন্ধে হয়ে গেল। অনেক দূরের রাস্তা মেখলিগঞ্জ। তারপর ঝড়বৃষ্টি। যেমন এলোমেলো হাওয়া, তেমনি বড়-বড় ফোঁটার বৃষ্টি। গাড়ি একটু যায় আর থামে। হেডলাইটের আলোয় বেশি দূর দেখা যায় না। এই করে যখন মেখলিগঞ্জে পৌঁছলাম, তখন প্রায় মধ্যরাত্রি।

ছোট শহর মেখলিগঞ্জ। প্রায় এস ডি ও'র কাছারি ঘিরে গড়ে উঠেছে শহরটা। পি ডবলু ডি বাংলোতে পৌঁছে অনেক হাঁকডাক করার পর চোখ রগড়াতে রগড়াতে পাহাড়ি চৌকিদার দাজু উঠে এসেই আমাদের কৈফিয়ত তলব করল, এত রাত্রে কেন এলাম। আমতা-আমতা করে উত্তর দেবার আগেই সে বলল যে, সাহেবরা চলে গেছেন সাতটায়, নাজিরবাবু ফিরে গেছেন আটটায়, তাঁর খাস পিওন চলে গেছে নটায়, আর এখন ডিউটিতে আছে পানু। 'পানু কে', জিজ্ঞেস করার আগেই চৌকিদারের হাঁকে কোথা থেকে হাজির হল সে। বেশ ঠাণ্ডা, প্রচণ্ড ক্লান্তি আর খুব খিদে, সব মিলিয়ে এক অবসন্ন ভাব। রাত অনেক, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করা হল, "পানু, কিছু খাবার পাওয়া যাবে?" বড় রকমে জিভ কেটে সে উত্তর দিলে, "আপনারা খাবার খাবেন কী স্যার? এস ডি ও সাহেবের হুকুম ডিনার দিতে হবে।" এই বলেই সে কোথায় অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

একটু পরেই বেশ কয়েকটা কুকুরের চিৎকার শোনা গেল। কিছু ঠাওর করার আগেই কালো কুচকুচে বিধ্বস্ত একটা ডেকচিতে তেমনি ময়লা একটা খবরের কাগজ ঢাকা দিয়ে টেবিলের ওপর ঠকাস করে রেখে ফের অন্ধকারে মিশে গেল পানু। বার কয়েক যাতায়াত করার পর খাবার টেবিলটা ভরে গেল ভাঙা নোংরা কতগুলো ডেক্‌চি আর ছেঁড়া ময়লা খবরের কাগজের টুকরোতে। এবার পানু চৌকিদার দাজুকে অনুরোধ করল ডিনার লাগাতে। দাজু বিনা বাক্যব্যয়ে এক গোছা চাবি পানুর হাতে দিল। আর পানু আলমারি খুলে চট্‌পট্‌ করে কাঁচের প্লেট, গেলাস আর দু-একটা চামচ দিয়ে টেবিলের প্রান্তে যে জায়গাটুকু ছিল তা ভরিয়ে দিয়ে একগাল হেসে বলল, "ডিনার লাগিয়েছি, আপনারা আসুন।" খাবার দেখে খিদে উবে গেলেও পানুর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে অবশ্যম্ভাবী ভেদবমির রিস্ক্‌ নিয়ে ওরই মধ্যে বেছে কিছু খাবার দাঁতে কাটার চেষ্টা করলাম। কানে তখনও কুকুরদের প্রচণ্ড বঞ্চনার আর্তনাদ বাজছে। ওদের বঞ্চনা করে এই খাবারগুলো গলাধঃকরণ করার নৈতিকতা নিয়ে মনে তখনও সন্দেহ জাগছিল। আমাদের খাবার আগ্রহের অভাবে পানু একটু সংকোচ বোধ করছিল। তাকে চাঙা করার জন্য সহযাত্রী অশোক আলাপ জমাবার চেষ্টা করল। পানুকে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের খাবার না দিয়ে ডিনার খাওয়াচ্ছ কেন? খাবার আর ডিনারের তফাত কী?" সপ্রতিভ মুখে একটু লজ্জার রেশ এনে পানু বলল, "কেন স্যার আপনারা আমার সঙ্গে রহস্য করছেন? কে না জানে মেখলিগঞ্জে আমাদের হোটেলে বেঞ্চিতে বসে কলাপাতায় ডাল, ভাত আর লাবড়া, যা দুপুরে দেওয়ানি কোর্টে আসামি আর সাক্ষীরা খায়, তাকে খাবার বলে, আর বাংলোতে চেয়ারে বসে টেবিলে কাঁচের পিলেট-গিলাসে

চামচ দিয়ে বি ডি ও, এস ডি ও সাহেবের মতো বড়-বড় সাহেবরা যা খায়, তাকে ডিনার বলে।"

"আমাদের হোটেল" কথাটা শুনে আমাদেরও যেন সব জট পাকিয়ে গেল। এ ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "আমাদের হোটেল মানেটা কী পানু? কার হোটেল?"

ফিক্ করে হেসে পানু বলল, "হোটেল মালিকের। আমি ঐ হোটেল দেখাশুনো করি। কাছারির উঠানের পাশে হোটেল, তাই দরকার-অদরকারে নাজিরবাবুকে যদি দেখাশুনো না করি, তা হইলে বেইমানি হয়। তাই রাত-বিরেতে বাংলোয় প্যাসেঞ্জার এলে নাজিরবাবুর হুকুমে আমিই ফাইফরমাস খাটি। নাজিরবাবু আর কোর্টের সব সাহেবরা সবাই আমায় খুব ভালবাসেন। ওঁরা বলেছেন, আমি এখন উমেদারের অ্যাপেনটিস্, কিছুদিন পরে আসল উমেদার হব। দ্যাখেন শুধু নিজের কথাই কইলাম, আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

ওকে আশ্বস্ত করার জন্যে আমরা চারজনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম, "মোটেই না—মোটেই না।" এবং পানুর মন ভাল করার জন্য ওর মুখ চেয়ে লালচে-কালো থকথকে ঝোল থেকে মাংসজাতীয় একটা বস্তু মুখে দিলাম। কাশ্মীর থেকে কেরল, ভারতের নানা জায়গায় নানারকম ঝাল খাবার খেয়েছি; এমন কী অন্ধ্রের প্রসিদ্ধ 'আজকাই' আচার পর্যন্ত। কিন্তু এরকম পরম দমবন্ধ-করা ঝাল কোনোদিন খাইনি। মনে হল, একটা গরম খুন্তি দিয়ে জিভ থেকে আলজিভ পর্যন্তকে যেন ছ্যাঁকা দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস বন্ধ, চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম।

এবার শোবার পালা। মুখ ধুয়ে ঠিকঠাক হতেই চৌকিদার দাজু বললে যে, ১ নং ঘরে ডিপার্টমেণ্টাল লোক, কাজেই দুজনের ব্যবস্থা ২ নং ঘরে, আর দুজনের ব্যবস্থা হয়েছে তিস্তার বাঁধের ধারে ইরিগেশনের বাংলোতে। পানু পাশ থেকে খবর দিল, ইরিগেশন বাংলো পুরোটাই রাখা আছে আমাদের জন্য। আধ মাইল দূরে ইরিগেশন বাংলোতে যখন পৌঁছলাম, তখন মধ্যরাত পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অনেক ডাকাডাকি, কান-ফাটানো ডবল হর্নের আওয়াজ করার পর একটা সূক্ষ্ম আলোর রেশ দেখা গেল অনেক দূরে। বিস্তীর্ণ নদীর ধারে জংলা জায়গা, কিছু আগে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে, মনে হল আলেয়া দেখছি না তো?

"আইজ্ঞা স্যারেরা পেন্নাম হই।"

শুনে চমকে উঠে দেখি গেটের ওপারে একটা বড় থুজা গাছের পাশ থেকে এক ধূসর সাদা মূর্তি গেটের দিকে আসছে। সে-ই চৌকিদার এবং আমাদের সম্ভাষণ সে-ই জানাচ্ছে।

গেট খুলে গাড়ির হেডলাইটের আলোয় পথ চিনে ভেতরে গিয়ে বললাম, "আমরা চারজন আছি, দুটো ঘর খুলে দাও।"

বিনীত উত্তর এল, "আইজ্ঞা ডিপার্টের লোক আছেন, আপনাদের একটা ঘরই আছে।"

আর দেরি না করে আমাদের দুই সহযাত্রীকে পি ডবলু ডি বাংলোয় পাঠিয়ে দিয়ে ব্রজগোপাল আর আমি এখানে রয়ে গেলাম। লোডশেডিং চলছে, বাইরে মেঘ, তাই শুক্লপক্ষ হলেও আলোর রেশ নেই। নিকষ অন্ধকার।

ব্রজগোপাল খুবই বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল যে, একটা লণ্ঠন বা মোমবাতি পাওয়া যাবে কি না। ততোধিক নম্র কণ্ঠে চৌকিদার জানাল, বড়-বড় বাঁধের কাজ ও জিনিসের জন্য 'টিণ্ডার' ডাকা হয়েছে জলপাইগুড়িতে। এর পরের বার এলে লোডশেডিং-এ আর কোনো কষ্ট হবে না।

আমার ছোট পিক্স টর্চের আলোয় চৌকিদার বিছানা করে দিল। প্রায় কাজ শেষ

ক্লোজ-আপ তাজা নিঃশ্বাস, আর ক্লোজ-আপ সাদা দাঁতের জন্যে

স্বচ্ছ লাল

ক্লোজ-আপ

একাধারে টুথপেস্ট আর মাউথওয়াশ

আপনি যখন সত্যিসত্যিই লোকের খুব কাছে থাকেন, আপনার চাই ক্লোজ-আপ—এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের টুথপেস্ট। এর আসল মাউথওয়াশ দিয়ে আপনার নিঃশ্বাস হয় ক্লোজ-আপ-তাজা, আর দুটি বিশেষ উপাদান দিয়ে আপনার দাঁত হয় ক্লোজ-আপ-সাদা!

কাছে, আরো কাছে পেতে—

ক্লোজ-আপ

হিন্দুস্থান লিভার-এর উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-CX. 35-1812 BG

হবার সময় হঠাৎ এক স্বগতোক্তি শুনলাম—"নাঃ, কিছু ভয়ের নাই।"

বাঁধের ধার,কিছু আগে পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে, বাইরে তখনও বেশ এলোমেলো হাওয়া, কাছাকাছি আগাছার জঙ্গল। মিশকালো মেঘের জন্য সর্বত্র নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। জায়গাটা তেমন ভাল লাগছিল না। সাপখোপের ভয় হচ্ছিল। তারপর এই অযাচিত উক্তি। বেশ ভীত হয়ে দুজনে প্রায় একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, "সাপ খোপ নেই তো?"

"আইজ্ঞা উনারা তো বাইরে থাকেন। তবে মাঝে-মধ্যে উনাদের দু-একজন ভিতরে আসেন।"

শুনেই তো শরীর প্রায় হিম হয়ে এল। ফের জিজ্ঞেস করলাম, "যাঁরা ভেতরে আসেন, তাঁরা কারা?"

"আইজ্ঞা উনারা উঁচু জাতের গোখরো, কাল-কেউটা, বোড়া। সকলেই মা-মনসার আপনার নোক।"

আঁতকাবার কথা, এবং সত্যি সত্যিই আঁতকে উঠলাম এবার। আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, "ঘরে কেউ নেই তো!"

"কি কইরা কই বলেন। এই আঁধারে কে কোথায় থাকেন কে জানে। তবে উনারা মায়ের নোক, ওনাদের যাতনা না দিলে উনারা ক্ষেতি করেন না। তবে যদি দ্যাখেন বিছানায় শুবার পর গায়ে কিছু হিরহির করে, শিরশির করে, আপনারা কিন্তু লড়বেন না, চড়-চাপড় মারার চেষ্টা করবেন না, টর্চ লাইট জ্বালাবেন না। টানটান হইয়া যেমন শুইয়া ছিলেন তেমনই থাকবেন। শুধু আস্তে বলবেন, হেঃ। যদি তেনারা তখনও গায়ে থাকেন, আবার বলবেন হেঃ হেঃ—হেঃ হেঃ হেঃ। বলতে থাকবেন একটু পরপর যতক্ষণ না তেনারা যান। যদি এভাবে না কইরা ওনাদের ক্ষেতি করতে যান, তা'হলে তেনারা তো মানী নোক, মা-মনসার নিজের নোক, তেনারা রেগে যাবেন। রেগে উনারা কেটে দিতে পারেন। আর কেটে দিলে আপনারা মরে যাবেন। তবে ভয়ের কিছু নাই। একজোড়া ছিলেন—বড় জাতের তেনারা। তবে মনে হয় তেনারা বাইরে গেছেন।"

ব্রজগোপাল অতি ক্ষীণ স্বরে বলে উঠল, "যা শোনালে, তারপর তো আর ঘুম হবে না। দরকার হলে ডাকলে তোমাকে পাওয়া যাবে তো?"

কথাটার উত্তর না-দিয়ে আগের মতো নম্রভাবে চৌকিদার আবার বলল, "আর-একজনও আছেন। তবে নাঃ, তিনি কিছু করেন না, যদি আপনারা তেনাকে বিব্রত না করেন, বা ঢ্যালা না মারেন।"

"কে তিনি?" প্রশ্ন করলাম।

"তিনি এক জিন সাহেব। তিনি ওই সুপারি বাগানে থাকেন। এই বাংলোর পাশ দিয়ে তিনি মাঝে-মাঝে তিস্তায় যান। আগে তাঁর বাড়ি ছিল বাঁধের ওপারে, এখন সেটা জলের ভিতর। তাই তিনি মাঝে-মাঝে তাঁর পুরনো জায়গায় যান তিস্তার ভেতর। তাঁর দাড়ি সাদা, জোব্বাও সাদা। অ্যামনে কিছু বলেন না। তবে ঢ্যালা মারলে বা অন্য কোনো ভাবে বিব্রত করলে তিনি রেগে গিয়ে ঘাড়ে চাপ্পে বসেন। আর হক্কা ঘাড় হইলে মট্ করে ভেঙেও দেন। তবে সাহেব নোক খুব ভাল, খুব বেশি কারুর ক্ষেতি করেন না। আপনভোলা নোক, আপন মনেই ঘুরে বেড়ান।"

বিছানায় শুলে গায়ে হিরহির শিরশিরের সম্ভাবনা, জানালার অনতিদূরে সাদা জিনের আনাগোনা। ঠিক করলাম গল্প করে বাকি রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু সারাদিনের গাড়ির ধকলে ও না-খাবার অবসন্নতায় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।ঘুমের ঘোরে শুনতে পেলাম কে যেন হিসেব দিচ্ছে সাহেবদের চা তিরিশ পয়সা দু কাপ ষাট পয়সা। লাঠি-বিস্কুট পনেরো পয়সা করে দুটো তিরিশ পয়সা। আর ছোঁড়াটার দশ পয়সা। একুনে এক টাকা। মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি যে, সবে ভোরের আলো ফুটছে—আর জানলার ওপাশে সাদা কাপড় মুড়ি দিয়ে এক নরমূর্তি বিড়বিড় করে কী হিসেব আওড়াচ্ছে। দেখেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। দেরি না করে মানিব্যাগ হাতড়ে একটা ছোট নোট, মনে হল দু টাকার নোট, নিয়ে মশারির ফাঁক দিয়ে জানালার কাছ হাত বাড়াতেই—হিমেল স্পর্শের বদলে অনুভব করলাম একটা জীবন্ত হাতের বলিষ্ঠ ছোঁয়া। তার সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হল আমার নোটটি ও সাদা মূর্তিটি।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় **সদাশিব** অগ্নিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

(এরপরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

বিষাক্ত পা সদ্য সেরেছে রয়ের কিন্তু বসরানের শেখের ঔদ্ধত্য দেখে সে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মাঠে না-নেমে পারল না। তারপর···

কীভাবে কাটাল দ্যাখো! শাবাশ রয়!

যাঃ!

রয়ের জন্যে সবাই উদ্বিগ্ন···

দারুণ খেলছে!

ROVERS

হ্যাঁ! কিন্তু বাঁ পা কেমন আছে কে জানে!

এক্ষুনি সেটা বোঝা যাবে!

রয় বল পাচ্ছে!

হ-হ-হ-হ-হ-হ

হ-হ-হ-হ! একটুর জন্যে ফশকাল!

হঠাৎ!

নিশ্চয় বাঁ পায়ে ফের চোট লেগেছে!

আরে, ট্যাফি আসছে কেন?

কেউ জখম হয়নি! তাহলে এসেছ কেন?

রয় যে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল! শোনোনি?

যাচ্চলে!

যন্ত্রণায় চেঁচাইনি! আক্ষেপে! গোলটা হওয়া উচিত ছিল!

অ্যাঁ?

পা ঠিক আছে, ভেবো না!

রয় ঠিকই বলেছে···
পায়ে একটুও ব্যথা নেই! টোটকায় কাজ হয়েছে।
কিসের টোটকা? এখন খেলাটা ফের শুরু করতে পারি কি?
রয় গোল ফশকেছে দেখে শেখ খুব খুশি···
রয় খেলা সত্ত্বেও আমরা জিতব। সেটাই চাই।
কিন্তু ও খুব বড় খেলোয়াড়।
আঃ
কীভাবে আমাদের কাটিয়ে বেরোচ্ছে দেখুন!
গোলে মারো, রয়!
এবারে ভুল হল না···
তাই মারছি!
দারুণ! দারুণ!
বাঁ পা কাজ করছে!
দারুণভাবে করছে!
অতঃপর···
আরবরা তো নাজেহাল।
যা বলেছ!
গাইলস ঢুকছে।
ROVERS
গাইলস রয়কে বল দিতেই···
তুমি মারো!
সরে যাও!
টু নিল!
উঃ, এই রয়কে যদি আমাদের টীমে পেতুম!
আমরা তাহলে বিশ্বজয়ী হতুম!
হুম্‌ম্‌!
যে-ভাবেই হোক, ওকে চাই!
যত টাকা লাগে, দেব!
ROVERS
এর পর আগামী সংখ্যায়
কিন্তু রয় কি রোভার্স ছেড়ে বসরানে যাবে?

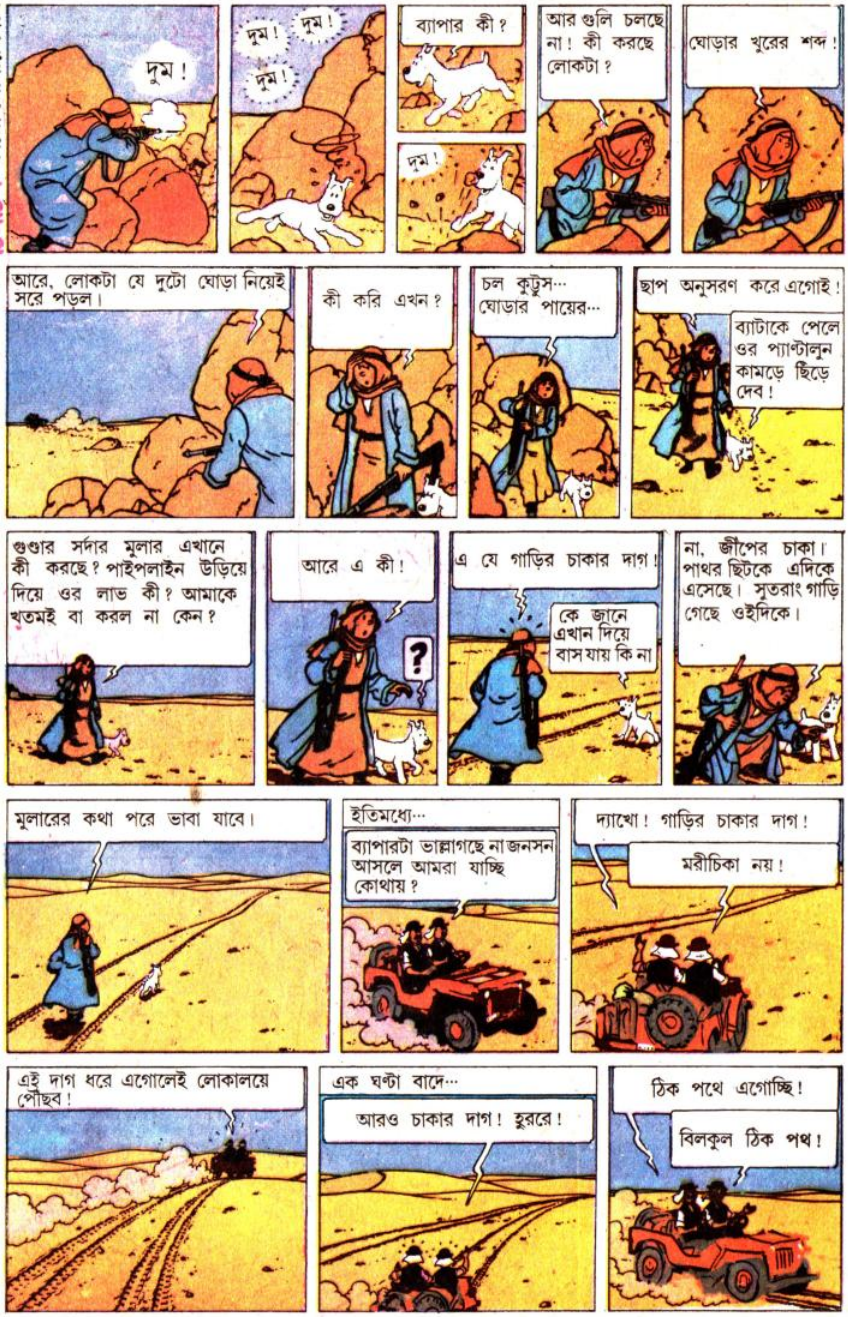
দুম!
দুম! দুম! দুম!
ব্যাপার কী?
দুম!
আর গুলি চলছে না! কী করছে লোকটা?
ঘোড়ার খুরের শব্দ!
আরে, লোকটা যে দুটো ঘোড়া নিয়েই সরে পড়ল।
কী করি এখন?
চল কুট্টুস··· ঘোড়ার পায়ের···
ছাপ অনুসরণ করে এগোই!
ব্যাটাকে পেলে ওর প্যান্টালুন কামড়ে ছিঁড়ে দেব!
গুপ্তার সর্দার মুলার এখানে কী করছে? পাইপলাইন উড়িয়ে দিয়ে ওর লাভ কী? আমাকে খতমই বা করল না কেন?
আরে এ কী!
?
এ যে গাড়ির চাকার দাগ!
কে জানে এখান দিয়ে বাস যায় কি না
না, জীপের চাকা। পাথর ছিটকে এদিকে এসেছে। সুতরাং গাড়ি গেছে ওইদিকে।
মুলারের কথা পরে ভাবা যাবে।
ইতিমধ্যে···
ব্যাপারটা ভাল্লাগছে না জনসন আসলে আমরা যাচ্ছি কোথায়?
দ্যাখো! গাড়ির চাকার দাগ!
মরীচিকা নয়!
এই দাগ ধরে এগোলেই লোকালয়ে পৌঁছব!
এক ঘণ্টা বাদে···
আরও চাকার দাগ! হুররে!
ঠিক পথে এগোচ্ছি!
বিলকুল ঠিক পথ!

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

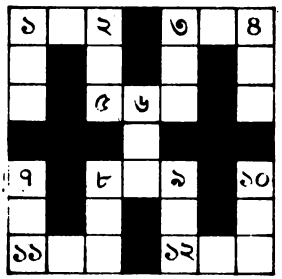

সংকেত : পাশাপাশি : (১) বেরাল। (৩) খেলার সামগ্রী। (৫) হৃষ্টপুষ্ট। (৮) অতুলপ্রসাদ সেনের কাব্যগ্রন্থ। (১১) সাদা। (১২) রসজ্ঞ।

উপর-নীচ : (১) এমন একটি কুটিরশিল্প, যার উপাদান উদ্ভিদ। (২) বাংলা পরিভাষায় এক্স-রে আবিষ্কর্তার নাম। (৩) আকাশচারী। (৪) অভিনয়ের বিষয়। (৬) অর্জুন যার সাহায্যে লক্ষ্যবেধ করেছিলেন। (৭) বটগাছ। (৮) একটি রাজধানী-শহর। (৯) তরল পদার্থের মাপ। (১০) পেঁচা।

১ জুলাই তারিখে আগের শব্দ-সন্ধানের যে-সমাধান ছাপা হয়েছে তা থেকে শ, উ, ল—যথাক্রমে এই তিনটে হরফ পালিয়ে গেছে। তোমরা নিশ্চয়ই পাকড়াও করেছ তাদের।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

কু	মি	র		পূ	র্বা	শা
মে		ক্ষী		ষা		ল্ম
রু	ই		পা		অ	লি
		ধ্রু	প	দ		
দো	ল		ড়ি		বা	হু
তা		দ্বি		পো		লি
রা	জ	ত্ব		ত	ন	য়া

সেজদাদু যে কোষ্ঠী-ঠিকুজিতে একটু-আধটু বিশ্বাস করেন, এসব নিয়ে চর্চা করেন—জানা ছিল, কিন্তু ছোটকারও যে এ-ব্যাপারে উৎসাহ রয়েছে জানতাম না।

সেদিন সকালে চিলেকোঠায় গিয়ে দেখি, ছোটকা আর সেজদাদু দুজনে মিলে বিরাট বিরাট সব কোষ্ঠী-ঠিকুজি খুলে নিজেদের মধ্যে কীসব আলাপ-আলোচনা করছে। মাঝে মাঝে সাদা কাগজে ছক কাটছে, পুরনো পঞ্জিকা দেখছে উলটে-পালটে, ছকগুলো নিজেরা

ভর্তি করছে। দু-একটা ইংরেজি-বাংলা মোটাসোটা বইও খোলা, সেগুলোতেও নানান ছকের ছবি।

এরই মধ্যে আমাকে হাতের ইশারায় বসতে বলেছে ছোটকা। বসে আছি তো বসেই আছি। রাশি-লগ্ন, বৃশ্চিক-কুম্ভ, ঘণ্টা-মিনিট, এমন কী সেকেণ্ড নিয়েও এমন একাগ্র আলোচনা চলছে যে আমার পক্ষে কোনো কথাই এখন বলা সম্ভবপর নয়। অথচ ছোটকা জানে যে, ধাঁধা নিতে এসেছি আমি। কতক্ষণ বসতে হবে কে জানে।

হঠাৎ ছোটকা বলল, "পেয়েছি। ফার্স্ট ক্লাস।"

সেজদাদু তখন আপনমনে ছক ভর্তি করছে। চোখ না তুলেই প্রশ্ন করল, "কী!"

"সতুবাবুর ধাঁধা।" ছোটকার জবাব শুনে সেজদাদুর মতো আমিও চমকে উঠি। এর মধ্যে আবার ধাঁধা এল কোত্থেকে।

কিন্তু সত্যিই ধাঁধা ছিল। ছোটকার বলা সেই ধাঁধা দিয়েই এবারের ধাঁধার শুরু।

প্রথম ধাঁধা ॥ বাবা, মা ও ছেলের বয়সের যোগফল সত্তর বছর। বাবার বয়স ছেলের বয়সের ঠিক ছয় গুণ।

তিনজনের বয়সের যোগফল যখন এখনকার বয়সের যোগফলের দ্বিগুণ হবে, তখন বাবার তখনকার বয়স হবে ছেলের তখনকার বয়সের দ্বিগুণ।

তখন বাবার বয়স হবে ঠিক আটান্ন বছর চার মাস।

এ থেকে বলতে হবে, মায়ের এখনকার বয়স কত।

ছোটকা তো বয়সগুলো পেয়েছে কোষ্ঠী থেকে, তোমরা কীভাবে বার করবে? সেটাই তো ধাঁধা।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ শব্দটার জট তো ছাড়াবেই, মানেটাও বলতে হবে—

উ ন পা ৎ

তৃতীয় ধাঁধা ॥ নীচের সংখ্যাটির মতো সংখ্যা একটিই হতে পারে, কেন? কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে সংখ্যাটায়?

৮ ১ ৪ ৬ ২ ৯ ৫ ০ ৭

গতবারের উত্তর ॥ (১) কাঠের হাঁস ৫টা পঞ্চাশ টাকা, মুরগি ১টা তিন টাকা, খরগোশ ৯৪টা সাতচল্লিশ টাকা। এই একশো খেলনার দাম একশো টাকা। (২) যে ঘড়িতে আধ ঘণ্টা পরপর ঘণ্টা বাজে তার হিসেবেই সাজানো সংখ্যাগুলো। তাই পরবর্তী সংখ্যা চারটে হবে—১,৪, ১, ৫। (৩) অংশুমালী।

সত্যসন্ধ

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল বন্দুকের ট্রিগারের ফোটো
ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ একটা চোর ধরা পড়েছে, কিন্তু ওর মুখ থেকে কোনো কথা বার করা যাচ্ছে না, কী করা যায় বলুন তো?

উঃ চড় মারতে থাকো, দেখবে অষ্টম চড়ে ঠিক রা কাড়বে।

প্রঃ কোন পর্বতের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে?

উঃ গন্ধমাদন পর্বতের।

প্রঃ আমি রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ করছি। মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শূর্পণখার ইংরেজি নাম কী দেব বলুন তো?

উঃ sharpo-নখা দিতে পারো।

প্রঃ আমার ছোট কুকুরটাকে আয়নার কাছে নিয়ে যেতেই প্রচণ্ড ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল। আয়নায় প্রতিবিম্ব দেখে ও কী বলতে চাইছিল আপনার মনে হয়?

উঃ আয় না!

সুসেন

এ-খেলার জন্য চাই পাঁচটি দেশলাইকাঠি আর যে-কোনও একজন বন্ধু, যাকে খেলাটা দেখাবে।

পাঁচটা কাঠিকে নীচের ছবির মতো সাজিয়ে রাখো—

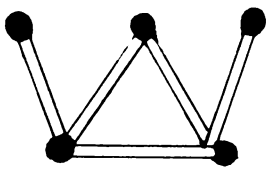

এবার বন্ধুকে বলো পাঁচটা দেশলাইকাঠিকে এমনভাবে, এদিক-ওদিক করে সাজাতে হবে যাতে দুটো ত্রিভুজ তৈরি হয়।

দ্যাখো চুপচাপ, বন্ধু কী করে। পারে কি না। যদি পারল, তাহলে তো খুবই ভাল। কিন্তু পারার সম্ভাবনা কম, কেননা তুমি এমনভাবে সাজিয়ে দিয়েছ যে, চট করে বুদ্ধি খেলতে চাইবে না।

না পারলে তোমাকেই উত্তর করে দিতে হবে। সুতরাং তুমি কী করবে শিখে নাও। অবশ্য তুমি যদি নিজে পেরে থাকো, তাহলে আর শিখবে কেন। যারা পারোনি, তাদের জন্য শিখিয়ে দিচ্ছি উত্তরটা।

নীচের ছবি থেকেই স্পষ্ট হবে—

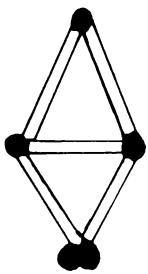

সহজ কিন্তু দারুণ মজাদার খেলাটা। তাই না?

মজারু

অফিসের বড়বাবু তাঁর বেয়ারা সুদামকে একদিন মজা করে বললেন, "হ্যাঁ রে, সুদাম, তুই যদি আমার মতো বড়বাবু হতিস আর আমি যদি তোর মতো সুদাম হতুম, তাহলে তুই কী করতিস?"

সুদাম গদগদ হয়ে বলল, "সে কি আর খুলে বলার দরকার আছে বড়বাবু? আমি প্রথমেই আপনার একশো টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতুম।"

★

"আপনি তো কথায়-কথায় খুব গ্রাম-গ্রাম করেন, কিন্তু আপনি তো আসলে মশাই শহরের মানুষ। এর পরে যদি আপনাকে সত্যি-সত্যি কখনো গাঁয়ের ছেলে হয়ে জন্মাতে হয়, তাহলে আপনি কোন গ্রামটি বেছে নেবেন? নিশ্চিন্দিপুর?"

"আজ্ঞে না, সন্দেশখালি।"

★

গৃহকর্তা অতিথিকে বললেন, "আপনি কী খাবেন, বলুন।"

"আমার জন্য আলাদা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে না, আপনি যা খাবেন, আমিও তাই খাব।"

গৃহকর্তা হাত কচলে বললেন, "আমি তো একাদশীতে বিশেষ কিছু খাই না।—শুধু একটু জল। আপনার জন্যেও সেই ব্যবস্থাই করব?"

★

যাত্রী: কী হল ড্রাইভার, এখানে গাড়ি থামালে যে।

ড্রাইভার: আজ্ঞে স্যার, চারদিক কাঁচ-লাগানো পাঁচিলে ঘেরা, সামনে একটা ছোট্ট গেট। গাড়ি ঢুকবে না।

যাত্রী: আলবত ঢুকবে, চালাও জোরসে। এত বড় চারতলা বাড়িটা ঢুকে গেল ওই গেট দিয়ে আর গাড়ি ঢুকবে না!

ছবি অহিভূষণ মালিক

প্রজাপতি প্রজাপতি দেখ লক্ষীটি,
আমার বাগান, ফুল আর আমি—তোমার পুরোন বন্ধুটি
প্রজাপতি প্রজাপতি জেম্‌স নাও এসে
তুমি আমি আর সব বন্ধু মিলে খাই ভালবেসে !

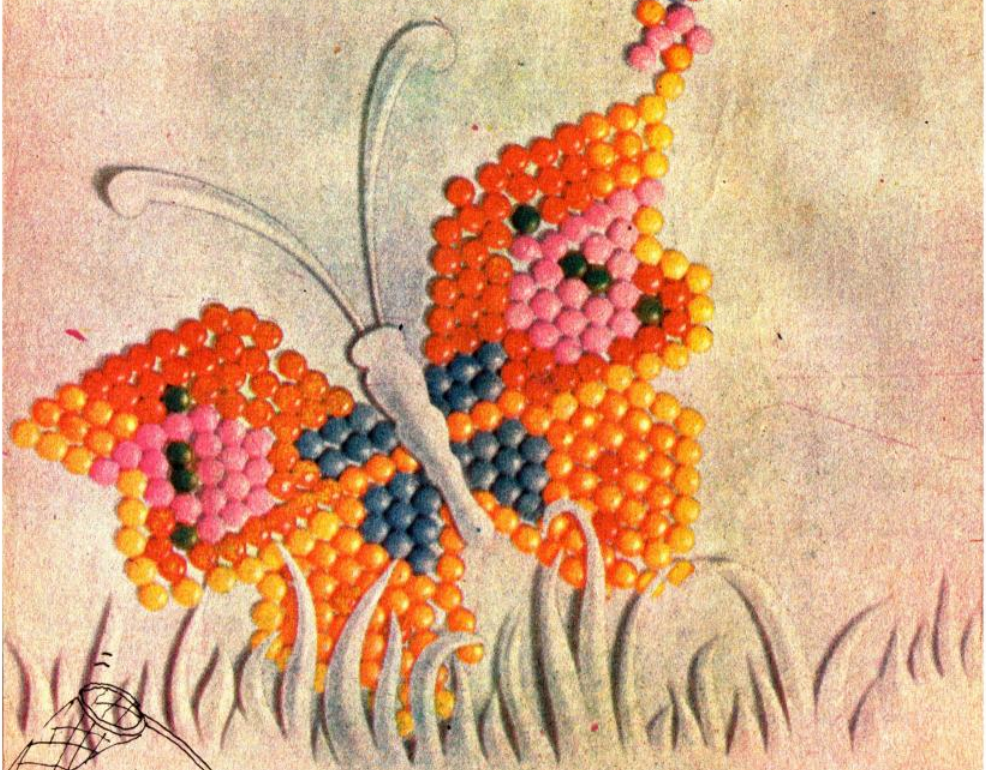

পলে পলে জেম্‌স মুখে,
জীবন কাটে সুখে সুখে!

ক্যাডবেরিস
চকলেটস

ক্যাডবেরিস্ জেম্‌স থাকলে ভাই, বন্ধু পাওয়ার ভাবনা নাই।

UBM/0641/DIN

ডাকাত চিতপটাং

জীবন ভৌমিক

অম্বুবাচি না থাকলে সেদিন ডাকাত ধরা পড়ত না। অনেকেই হয়ত ভাববে, অম্বুবাচির সঙ্গে ডাকাত ধরা পড়বার সম্পর্ক থাকে কেমন করে! ওই তিথিটা কি ডাকাতদের পক্ষে খারাপ সময় নাকি!

তা জানি না। তবে সবাই বলছে, অম্বুবাচি না থাকলে কিছুতেই সেদিন ডাকাত ধরা পড়ত না।

দিন-দুপুরে গয়নার দোকানে ডাকাতি! দোকান ছোট। কিন্তু জায়গাটা গমগম করছে। ট্রাম যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে, হকার-ভর্তি ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা দিয়ে লোক চলছে। তার মধ্যে খোলা দোকানপাটগুলোর মধ্যে একটু আলসেমি ভাব, কেউ কেউ হাই তুলছে। কারণ, ভরদুপুরে কেনা-বেচা কম।

ট্রামরাস্তা থেকে বেরিয়ে-আসা এক ফালি সরু রাস্তায় দু মিনিট হাঁটলেই দুষ্টুদের বাড়ি। রাস্তার ধারে গ্রিল দেওয়া বারান্দায় বসে দুষ্টুর ঠাকুমা মস্ত এক পাথর-বাটিতে সাগু মাখছিলেন আম আর কলা দিয়ে। জিভে জল নিয়ে দুষ্টু অপেক্ষা করছে কখন মাখা শেষ হবে। ঠাকুমার অম্বুবাচির দৌলতে তিন দিন ধরে দুষ্টুর ফলাহার বেশ জমে উঠেছে। গত কাল পিসেমশাই আবার দুখানা পাকা আনারস দিয়ে গেছেন। এইসব আনন্দে দুষ্টু আজ স্কুলেই গেল না।

আম-কলা দিয়ে সাগু মাখা হলে ঠাকুমা দুষ্টুকে বলল, "যা একটা স্টীলের বাটি নিয়ে আয়।" দুষ্টু উঠতে যাবে এমন সময় বড় রাস্তা থেকে একটা শোরগোল ভেসে এল, "ডাকাত ডাকাত, বাঁচাও।" তার সঙ্গে বোমা ফাটার আওয়াজ।

দুষ্টুদের গলির মুখে গয়নার দোকানে ডাকাত পড়েছে। দোকানের কর্মচারীদের ছুরি, পাইপগান দেখিয়ে কয়েক লাখ টাকা ছিনতাই করে পালাচ্ছে ডাকাতরা। লোকজন ছুটে এলে ডাকাতরা বোমা ছুঁড়ছে। ডাকাতরা দুষ্টুদের গলিতে ঢুকে পড়েছে।

গলির দুধারের বাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে সবাই দেখছে। রাস্তার লোকজন ডাকাতের ভয়ে অনেকেই পালিয়েছে। কিছু দুঃসাহসী লোক তবু ডাকাত ধরার সুযোগ খুঁজছে।

ট্রাম-রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ডাকাতরা দুষ্টুদের গলি দিয়ে পালাচ্ছে আর বলছে, "এগুলেই গুলি করব।" দোকানের সামনের রাস্তায় বেশ জ্যাম। দুষ্টুদের গলিটা ট্রাম-রাস্তা থেকে বেরিয়ে উলটো দিকের একটা বড় রাস্তায় পড়েছে। ওই রাস্তাটা বেশ ফাঁকা। ডাকাতরা তাই বোধহয় গাড়িটা দুষ্টুদের গলির ওই মুখে রেখেছিল তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে পালাবার জন্য।

গোলমাল শুনে ঠাকুমা দুষ্টুকে টেনে ঘরে নিয়ে যেতে চাইছে। দুষ্টু যাচ্ছে না। গ্রিলে মুখ লাগিয়ে সে দেখছে। চারটে ডাকাত সামনে পেছনে দেখতে দেখতে ওদের বাড়ির গলি ধরে আসছে। দুষ্টুর পায়ে কী যেন ঠেকেছিল। কলা আর আমের খোসাগুলো ঠাকুমা ওখানে জমিয়ে রেখেছিলেন। একটা খোসাতে পা পড়তে সে পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।

ঠাকুমার সঙ্গে দুষ্টুর মা ছুটে এলেন দুষ্টুকে ঘরে নিয়ে যাবার জন্য। ওরা দেখল গ্রিলের বাইরে দিয়ে দু হাত বাড়িয়ে, হাত নাচিয়ে দুষ্টু বলছে, "পা পিছলে আলুর দম। হে ভগবান—।"

দুষ্টুর মা দুষ্টুকে টেনে কোলে তুলে বলছেন, "কী সর্বনেশে ছেলে, একটু ভয় নেই।" আর ঠিক তখুনি দেখা গেল, ডাকাতদের মধ্যে যার হাতে পিস্তল আর একটা থলে, সে হঠাৎই রাস্তার মধ্যে চিতপটাং হয়ে পড়ে গেল। তার হাতের অস্ত্র ছিটকে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে কয়েকটি সাহসী ছেলে এসে তাকে ধরে ফেলল। মায়ের কোল থেকে দুষ্টু তখন বলছে, "যা ভেবেছি তাই হয়েছে, পা পিছলে আলুর দম, বেশ হয়েছে—।" অন্য তিন জন ডাকাত তখন গলির মুখে-রাখা তাদের গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে।

মায়ের কোল থেকে নেমে পড়েছে দুষ্টু। আসলে মায়ের কোলে ওঠার বয়সও তার নেই। ক্লাস সিক্সে পড়ে সে। জোর করে কোলে তুলে মা তাকে ঘরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এখন ওরা সবাই বারান্দায়। ডাকাতের সর্দারকে পাড়ার লোকেরা বেঁধে ফেলল। ডাকাতের সঙ্গে ছিল থলে-ভর্তি টাকার বাণ্ডিল।

এমন সময় দেখা গেল দুষ্টুদের উলটো দিকের বাড়ি থেকে বৃদ্ধ শ্রীপতিবাবু একরকম ছুটতে ছুটতে এসে দুষ্টুকে জড়িয়ে বুকে ধরে কোলে তুলে নিলেন। তাকে নিয়ে বারান্দার বাইরে এসে শ্রীপতিবাবু সবাইকে বললেন, "এই ছেলের বুদ্ধি আর বাহাদুরির জন্যই আজ ডাকাত ধরা পড়ল। আমি বারান্দা থেকে সব দেখছি। ভাবাই যায় না। ডাকাতরা যখন এই রাস্তা দিয়ে তাদের গাড়ির দিকে যাচ্ছিল তখন আমাদের এই দুষ্টু কী করেছে জানেন?"

রাস্তায় তখন জন-অরণ্য। শ্রীপতিবাবুর কথা শুনে সকলেই কৌতূহলী হয়ে উঠল। সকলেই জানতে চাইছে, কী করেছে দশ বছরের ছেলে দুষ্টু। শ্রীপতিবাবু বললেন, "তুমিই বলে দাও তো দাদু, তুমি কী করে ডাকাতকে চিতপটাং করলে!"

শ্রীপতিবাবুর কোল থেকে দুষ্টু বললে, "আমার ঠাকুমার অম্বুবাচি ছিল তো! তাই আম আর কলা দিয়ে ঠাকুমা সাগু মাখছিলেন খাবার জন্য। ডাকাতরা যখন পেছন ফিরে আমাদের গলি ধরে আসছিল তখন আমি কলা আর আমের সব খোসাগুলো রাস্তার মাঝখানে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। যদি পা পিছলে ওরা পড়ে! ঠিক তাই পড়েছে। তবে মাত্র একজন। বাকি তিনজন পালিয়েছে।"

পুলিশ অফিসার দুষ্টুকে আদর করে বললেন, "একজন যখন তুমি ধরিয়ে দিয়েছ, বাকি তিনজনকে ধরতে অসুবিধে হবে না।"

এরপর খবরের কাগজের লোকরা এসেছিল। দুষ্টুর ফোটো নিয়েছে। খবর নিয়েছে। কালকেই সব কাগজে দুষ্টুর ডাকাত ধরার খবর ছাপা হবে। ইতিমধ্যে দুষ্টুকে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে রাখলাম। দুষ্টুর ভাল নামটাও কিন্তু অভিনন্দন।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

খুকু আর রুমি

পাশের বাড়ির খুকুর
ছোট্ট একটা কুকুর
নাম রেখেছে রুমি,
আর কুকুরটার যে মালিক,
যার বন্ধু দুটো শালিক
তার নাম মৌসুমি।
ছোট্ট কুকুর জাত স্প্যানিয়াল
ছোটে ভীষণ তেজে,
খেলতে খেলতে খুকুর গেল
সাড়ে-দশটা বেজে।
মা'র বকুনির চোটে,
খুকু তীরের বেগে ছুটে
ঢুকল স্নানের ঘরে।
তেল আর সাবান মেখে,
ঘড়ির কাঁটা দেখে,
খুকু জামাকাপড় পরে।
স্কুলের গাড়ি আসে,
ভাত খেয়ে গোগ্রাসে
খুকু ওঠে স্কুলের বাসে।
রুমির নেই যে খেলার তাড়া
এবার ঠাণ্ডা হল পাড়া—
রুমি ঘুমোয় খাটের পাশে।

সুমন্ত্র বসু (বয়স ১৩)

জলসা

সিংহমশাই সভাপতি
হাতে চায়ের পেয়ালা।
হাতি নাচে পায়ে নূপুর,
শেয়াল বাজায় বেহালা।
সেতার বাজান বেড়ালমাসি,
হিপো বাজায় খোল।
খেয়াল শোনায় গাধার গলা,
বেবুন বাজায় ঢোল।
বাঘবাবাজি বাজায় সরোদ,
ভালুক বাজায় কাঁসর,
হনু ওস্তাদ তবলা পিটে
জমিয়ে দিল আসর
গাইল কোরাস কোকিল দোয়েল
শালিক টিয়া চন্দনা
সিংহমশাই হেঁকে বলেন
জলসাটা তো মন্দ না!

সুভাষ চক্রবর্তী (বয়স ১৩)

সাইকেল না সাঁতার

গ্রামের নাম ডোলপুর। সুন্দর ছোট গ্রাম, গাছপালায় ভরা। ডোলপুরের মধ্যে দিয়ে একটা নদী বয়ে গিয়েছে, নাম বহুরূপী। নদীটার সকালে এক রূপ, বিকেলে এক রূপ, সন্ধ্যায় আর এক রূপ। তাই এর নাম বহুরূপী।

এই গ্রামে থাকে দুই ভাই, অমল ও কমল। আর তাদের মা। অমল বড়, কমল ছোট। একদিন দুই ভাই হঠাৎ তর্ক করতে লাগল সাঁতার জানা ভাল? না, সাইকেল চড়তে জানা ভাল?

অমল বলে, "সাঁতার জানা ভাল।" কমল বলে, "সাইকেল চড়তে জানা ভাল।" তর্কের পর ঠিক হল কোনও ভাল কাজ করে এর প্রমাণ দিতে হবে। দুজনেই রাজি হল এই প্রস্তাবে।

কিছুদিন পরে দুই ভাই বহুরূপীর পাড়ে খেলা করছে, এমন সময় কমল পা পিছলে নদীতে পড়ে গেল। অমল লাফ দিয়ে জলে পড়ে কমলকে বাঁচাল। কমল ও অমল যখন পাড়ে উঠল, তখন অমল বলল, "দেখলি তো সাঁতার জানা ভাল।" কমল বলল, "হুম।"

কয়েক মাস পরে গ্রামে কী একটা রোগ দেখা দিল। অনেক লোক মারা গেল সেই রোগে। অমলও পড়ল সেই রোগে। ডোলপুরে কোনো ডাক্তার নেই। মা বললেন, "বাবা কমল, তুমি পাশের গ্রামে থেকে একজন ডাক্তার ডেকে আনো।"

কমল সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কয়েক ঘণ্টা পরে কমল ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। ডাক্তারবাবু অমলকে ভাল করে দিলেন। অমলের অসুখ সেরে গেলে কমল অমলকে বলল, "দেখলি তো সাইকেল চড়তে জানা ভাল।" অমল বলল, "হুম!"

অর্চিমান ভাদুড়ী (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে অরুণাংশুশেখর দাস (বয়স ৮)

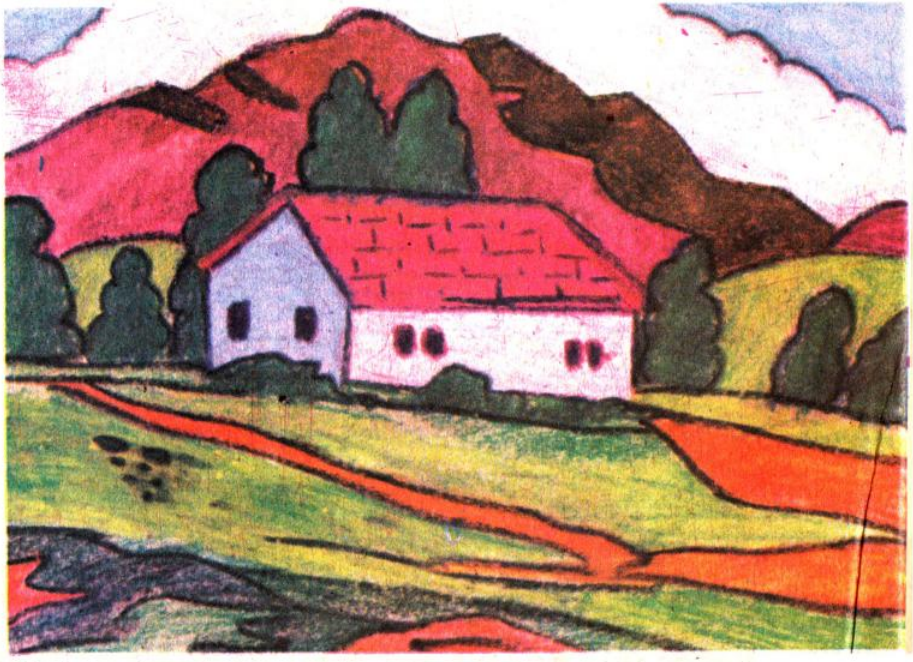

ছবি এঁকেছে মানস পাল (বয়স ৮)

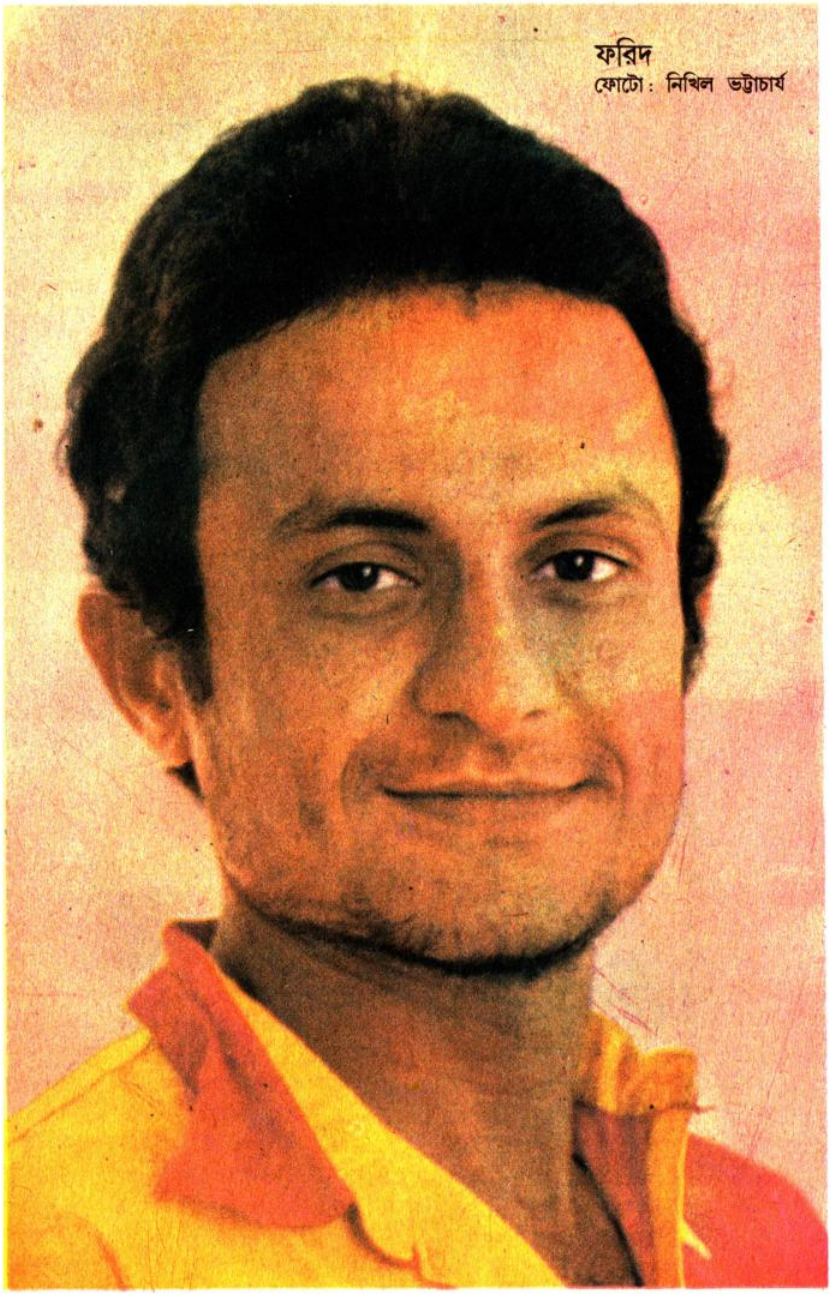

ফরিদ
ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

(পাতা ওলটালেই ফুটবলের খবর)

মাঝমাঠের ভরসা

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

যদি বলা হয় ইস্টবেঙ্গলের ফুটবল টীমের প্রথম একাদশের মধ্যে সাজোর আলম খান তাঁর স্থান পাকা করে নিয়েছেন, তাহলে অনেকেই অবাক হয়ে যাবেন। কিন্তু কথাটা সত্যি। ব্যাপারটা হল, নবাগত লেফট লিংকম্যান ফরিদের আসল নামটা অনেকের কাছেই অজানা। খেলার জগতে ডাকনাম 'ফরিদ'টাই কবে কীভাবে চালু হয়ে গেছে।

লিংকম্যান-সমস্যা ইস্টবেঙ্গলকে গত দু'তিন বছর যে-রকম ঝামেলায় ফেলেছে, সেরকমটি আর কোনও সমস্যা পারেনি। তাই ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা ১৯৮১-র সমস্যাগুলিকে গত বছর থেকেই ভাবতে শুরু করেন। ডি-সি-এম প্রতিযোগিতা চলার সময়েই ফুটবল সম্পাদক প্রশান্ত ঘোষ ফরিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ঐ প্রতিযোগিতায় মহ-মেডান স্পোর্টিং ও কোরীয় দলের বিরুদ্ধে ফরিদের আক্রমণাত্মক খেলা দেখে প্রশান্তবাবু মুগ্ধ হন। সল্ট লেকের প্রশিক্ষণ শিবিরে ফরিদ ডাক পাওয়ায় যোগাযোগটা ভালভাবেই বজায় থাকে। পরে যথাসময়ে ইস্টবেঙ্গলের অনুকূলে আন্তঃরাজ্য ছাড়পত্রে সই করেন তিনি। অমলরাজ ও মাচাডোর সঙ্গে ফরিদকে পেয়ে ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তা-সভ্য-সমর্থকরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই পুলকিত। ফরিদও তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন।

ফরিদ হায়দরাবাদের ছেলে—যে হায়দরাবাদের স্থান ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের কাছে খুবই উঁচুতে। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধের হায়দরাবাদ তথা হায়দরাবাদ সিটি পুলিশের (বা পরবর্তী দশকের অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশের) স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত। কিন্তু তবুও হায়দরাবাদ বা অন্ধ্র বললেই মুহূর্তের মধ্যে মনের ক্যালিডোস্কোপে দ্রুত কয়েকটি মুখ উঁকি মেরে যায়—আজিজ, নূর, ইউসুফ খাঁ, মৈন, জুলফিকার। অথচ ফুটবলের রাজ্যের ছেলে ফরিদ শুরু থেকেই ফুটবল নিয়ে মাথা (কিংবা পা!) ঘামাননি। সাঁতার ও জিমন্যাস্টিকসের উপরই তাঁর টান ছিল। দক্ষতাও। অবশ্য শখ করে মাঝে মাঝে বল পেটাতেন হায়দরাবাদ পুলিশের স্টেডিয়ামে। ওখানেই একদিন তাঁর খেলা দেখে বিখ্যাত প্রাক্তন খেলোয়াড় ও বর্তমানের প্রশিক্ষক সলিমুল্লা বললেন, "তোমার মধ্যে ফুটবল আছে। নিজেকে নষ্ট না করে চলে এসো আমাদের এখানে।" কিছুদিন পরেই পুলিশের সুপরিচিত কালো-হলুদ জার্সি উঠল ফরিদের গায়ে। ফরিদের বাবা সাজাদে আলম খানও তাঁর যৌবনে কৃতিত্বের সঙ্গেই ঐ জার্সি পরেছিলেন।

পুলিশে চারবছর (১৯৭৫-৭৮) খেলার পর ফরিদ অন্ধ্র প্রদেশ অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে চাকরি নিয়ে দু'বছর ঐ অফিসের দলটিতেই খেলেন। বর্তমান কর্মস্থল বেঙ্গল ইমিউনিটি। বি-কম প্রথম বর্ষে পড়তে পড়তে চলে এসেছেন। জানালেন (২৯ জুন), কোনও কলেজের সান্ধ্য বিভাগে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাবার ইচ্ছা আছে।

সলিমুল্লা-ই ফরিদের প্রথম ফুটবল প্রশিক্ষক। বর্তমানে শান্ত মিত্র। পি. কে. ব্যানার্জি ও অরুণ ঘোষের কোচিংও কিছুটা পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, সলট লেক প্রশিক্ষণ শিবিরে। ফরিদ হায়দরাবাদে ইউসুফ খাঁ, সালে (ছোট) প্রভৃতি নামীদের সংস্পর্শে এসেও তাঁর খেলার রীতির উন্নতি ঘটানোর সুযোগ পেয়েছেন।

পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি উচ্চতাটা (ওজন ৬০ কেজি) ফরিদের কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ, তাঁর 'স্পট জাম্প' ও হেড খুবই ভাল। গত বছর ওড়িশায় জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলার বিরুদ্ধে ওঁর খেলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই এ কথা বলেছেন। হ্যাঁ, ঐ খেলাটিকেই ফরিদ তাঁর এ-যাবৎ সেরা খেলা বলে মনে করেন। আর স্মরণীয় খেলা? গত ডি. সি. এমে কোরীয় দলটির বিরুদ্ধে। "ও-রকম দুর্ধর্ষ খেলা আর কোনও দলের সঙ্গে খেলিনি।" এককভাবে খুব কম খেলোয়াড়ই ফরিদের কাছে সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। তবে অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশের বাসারভি (স্টপার) ওঁর কাছে প্রবল বাধাস্বরূপ ছিলেন। "ও দারুণ টাফ খেলোয়াড়," বললেন ফরিদ।

বাইশ বছর বয়সী (জন্ম ৭ জুলাই, ১৯৫৯) সপ্রতিভ, হাসিখুশি এই যুবকের ফুটবলই ধ্যানজ্ঞান। অবসর কাটে বই, বিশেষত ইংরেজি উপন্যাস পড়ে। প্রিয় লেখক লিউইস ল্যামুর। ক্যারাম খেলতেও খুব ভালবাসেন ফরিদ। আর সাইকেল চড়তে। অনুশীলন করতে ইস্টবেঙ্গল মাঠে ফরিদ রোজ তাঁর নতুন স্পোর্টস সাইকেলে আসেন সেই একডালিয়া রোড থেকে! কী খেতে ভালবাসেন ফরিদ? চিকেন ফ্রাই।

ফরিদের প্রিয় খেলোয়াড় হাবিব। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পেলে। বাংলার ফুটবলের মান সম্পর্কে ওঁর বক্তব্য—"দা বেস্ট ইন ইণ্ডিয়া"। ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ফরিদ আশাবাদী। ওঁর বক্তব্য, আমাদের ঘাটতি শুধু শারীরিক বলে ও দমে। স্কিলে অন্যদের তুলনায় আমরা খুব একটা পিছিয়ে নেই। স্পষ্ট বললেন, "যে-দেশে মনোরঞ্জন-প্রসূন-গৌতমের মতো খেলোয়াড় আছে, সেখানে স্কিলের অভাব কী করে বলি?" কঠোর পরিশ্রম করলে, উপযুক্ত খাদ্য ও বিশ্রাম পেলে আমরা ভারতীয়রাও বিশ্ব-ফুটবলের সামনের দিকে থাকতে পারি বলে ফরিদের বিশ্বাস।

ফরিদ ৪—২—৪ প্রথাতেই খেলতে ভালবাসেন। সোজাসুজি বললেন, রক্ষণাত্মক ৪—৩—৩ প্রথায় খেলতে চাই না। কীরকম মাঠ পছন্দ? খুব শুকনো নয়, আবার খুব ভিজেও নয়।

আনন্দমেলার পাঠকদের মধ্যে যারা ভাল ফুটবল খেলতে চায় তাদের উদ্দেশে ফরিদের বক্তব্য : মন দিয়ে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যাও।

ফরিদরা নয় ভাইবোন। ফরিদ চতুর্থ সন্তান। ভাইবোনদের অনেকেই জন্মস্থান মল্লাপল্লীতে বাবা-মা'র সঙ্গে আছেন। তবে হায়দরাবাদে ফেরার ব্যাপারে ফরিদের খুব একটা আগ্রহ নেই। সুযোগ হলে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে আপত্তি নেই।

"এতই ভাল লাগছে পশ্চিম বাংলাকে?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"খুব ভাল। শুধু একটা জিনিস বাদে।"

"কী জিনিস?"

একটু হেসে বললেন, "লোড-শেডিং!"

সারজিও

ফুটবল ও ব্রাজিল

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ফুটবল, ব্রাজিল ও পেলে—এই তিনটি নাম জড়িয়ে আছে একসঙ্গে। পেলের নাম ব্রাজিলের সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সেই সঙ্গে স্মরণ করেন এমন কয়েকজন প্রাক্তন ফুটবলারকে, যাঁরা ফুটবলের জগতে ব্রাজিলকে বিশেষ মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন।

এখন সাও পাওলোর সবচেয়ে নামী ফুটবলার হচ্ছেন সারজিও। গত এপ্রিলের

শেষের দিকে সাও পাওলোর মকসুদ হোটেলে সারজিওর সঙ্গে আমার এক সাক্ষাৎকারের সুযোগ ঘটেছিল। সারজিও ব্রাজিলের সেরা স্ট্রাইকার। সম্প্রতি বিশ্ব-কাপ ফুটবলের প্রাথমিক পর্বের খেলায় সারজিও উন্নত ক্রীড়ামানের পরিচয় রেখেছেন। ব্রাজিল অবশ্য সহজেই স্পেনের মূল প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সারজিও সাও পাওলোর খেলোয়াড়। সাও পাওলো ব্রাজিলের একটি রাজ্যের নাম।এই নামে একটি ফুটবল ক্লাবও আছে। এঁরা ওখানকার সাও পাওলোর লীগেও অংশ নেন। সাও পাওলোর লীগ খেলা হয় তিনটি ডিভিশনে। আমি অবশ্য পেশাদারি লীগের খেলার কথাই বলছি। প্রথম ডিভিশনে রয়েছে কুড়িটি দল, দ্বিতীয় ডিভিশনে ত্রিশটি, এবং তৃতীয় ডিভিশনে চল্লিশটি।

ব্রাজিলে অনেকগুলি স্টেডিয়াম আছে. আছেন অসংখ্য খেলোয়াড়। পেশাদারি খেলোয়াড়ের সংখ্যা এখন প্রায় আট হাজার। অপেশাদার খেলোয়াড়ের সংখ্যা তো কয়েক লাখ। খেলোয়াড়দের খেলার মানের ওপর নির্ভর করে অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ। সারজিওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ব্রাজিল ক্রীড়া-সাংবাদিক সংস্থার সভাপতি ফ্লাডিও এডাটো ইরিও লোজেস। ব্রাজিলে প্রত্যেকের নামই বিরাট। সেই জন্যেই বোধ হয় প্রথম নাম ধরেই ডাকার রেওয়াজ।

ফ্লাডিওর অনুরোধে সারজিও আমার হোটেলে এসেছিলেন দেখা করতে। ওঁর মুখেই শুনলাম সাও পাওলো ক্লাবে ওঁর পারিশ্রমিক ১০,৫০০ মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় এক লাখ টাকা।খেলোয়াড়দের আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল।

পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে ওখানকার প্রথম ডিভিশনের ফুটবল খেলোয়াড়েরা প্রতি মাসে পেতেন মাত্র ৭০/৮০ ডলার। অতীতের খেলোয়াড়দের ব্রাজিলের অধিবাসীরা সম্মানের চোখে দেখেন। খেলার মাঠে পরিচিতির সংযোগে এখন অনেকেই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছেন।

ব্রাজিলের লোকদের দৃঢ় বিশ্বাস, ১৯৫৮ সালে ব্রাজিল প্রথম বিশ্ব-কাপ পেলেও আন্তর্জাতিক খেলার আসরে এই দেশ স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৩৮ সালে। ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ওই বিশ্ব-কাপের আসরে ব্রাজিল তৃতীয় স্থান পেয়েছিল। সেমি-ফাইনালে ব্রাজিল হেরেছিল ২-১ গোলে। ইটালি ফাইনালে হাঙ্গেরিকে ৪-২ গোলে হারিয়ে পরপর দুবার বিশ্ব-কাপ লাভ করে।

সাও পাওলো করিনথিয়নস ক্লাবে ১৯৩৮ সালের এক খেলোয়াড় রোমিওর সঙ্গে আলাপ হল। রোমিওই ব্রাজিলের পক্ষে ইটালির বিরুদ্ধে গোলটি দিয়েছিলেন। রোমিও অতীতের কথা বলতে গিয়ে লিওনিডাস ডা সিলভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। লিওনিডাস পোলাণ্ডের বিরুদ্ধেই হ্যাটট্রিকসমেত চারটি গোল দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ইটালি বাদে সব দেশের বিরুদ্ধেই গোল করেছিলেন তিনি। ইটালির বিরুদ্ধে অবশ্য গোল করার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ ওই খেলায় তিনি দলে ছিলেন না। আর এজন্যে প্রশিক্ষক সেনর পিমেনব্রাকে সমালোচনার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল দীর্ঘদিন।

১৯৫০ সালে ব্রাজিলের মানুষদের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁরাই সেবার বিশ্ব-কাপ পাবেন। সরকার তড়িঘড়ি করে মারাকোনা স্টেডিয়াম তৈরি করেন। ফাইনালে অবশ্য ব্রাজিল উরুগুয়ের কাছে পরাজিত হয়েছিল শেষ মুহূর্তের গোলে। ১৯৫০ সালে ফাইনাল পুলের খেলা হয়েছিল লীগ প্রথার ভিত্তিতে। লীগের শেষ খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলেও ব্রাজিল সেবার বিশ্ব-কাপ পেতে পারত।

১৯৩৮ বা ১৯৫০ সালে ব্রাজিল বিশ্ব-কাপ লাভ না করলেও ওই দুই প্রতিযোগিতায় ব্রাজিলের ভূমিকা ব্রাজিলের ভবিষ্যৎ খেলোয়াড়দের উজ্জীবিত করেছিল। তার ফলে, একে একে দেখা দিয়েছেন গিলমোর, নিলটন স্যান্টোস, জাল্মা স্যান্টোস, গ্যারিঞ্চা, ডিডি, ভাভা, পেলে, অমারিলডো, জিটো, জাগালো প্রমুখ বিশ্ববন্দিত খেলোয়াড়। এঁরা ব্রাজিলকে একনম্বর ফুটবল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন।

সাও পাওলোর জোস জিটোও ১৯৫০ সালের তিন ফুটবল তারকা—জিজিনো, অ্যাডেমির ও জারের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। এই তিন খেলোয়াড়ই পরবর্তীকালে ব্রাজিলকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলায় উদ্বুদ্ধ করেছেন।

উইম্বলডন থেকে

ডেভিড ম্যাকম্যাহন

প্রখ্যাত ক্রীড়া-সাংবাদিক ডেভিড ম্যাকম্যাহন সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে এই রচনাটি তোমাদের উপহার দিচ্ছেন তিনি। আনন্দমেলার পাঠক-পাঠিকাদের জন্যই এটি বিশেষভাবে লেখা।

উইম্বলডন জেতা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। বিয়র্ন বর্গ কিন্তু একাদিক্রমে পাঁচ বছর ধরে সেই প্রতিযোগিতায় জিতেছেন; পাঁচ-পাঁচটি বছর ধরে মাথায় পরেছেন জয়ের মুকুট। অনেকেই সেই মুকুট কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারেননি। এবারে কিন্তু ম্যাকেনরো সেটা ছিনিয়ে নিলেন। বর্গের মুকুট এখন জন ম্যাকেনরোর মাথায়। ম্যাকেনরো যে তার জন্য কতটা খুশি, তাঁর একটি মন্তব্য থেকেই সেটা আমরা বুঝতে পারলুম। সিঙ্গলস ফাইনালে জেতার পরে কিশোরের-মতো-দেখতে এবং দুরন্ত শিশুর মতো ছটফটে, রাগী আর জেদি ম্যাকেনরো বললেন, বর্গের শাসনকাল যেন শেষই হচ্ছিল না, "শেষপর্যন্ত সেটা আমার হাতেই যে শেষ হল, তার জন্যে আমি দারুণ গৌরবান্বিত।"

সিঙ্গলস ফাইনালে জিতে, ট্রফি হাতে নিয়ে, ম্যাকেনরো যখন এই কথা বললেন, বর্গ তখন কী করছিলেন জানো? দেখলুম, চুপচাপ একপাশে দাঁড়িয়ে তিনি কোকাকোলা খেয়ে যাচ্ছেন। একটুও ভাবান্তর নেই। উদাসীন ও নির্বিকার। ম্যাকেনরো যে জিতবেনই, এমন কোনও নিশ্চয়তা অবশ্য ছিল না। বর্গ আর ম্যাকেনরো, দুজনেই দুর্ধর্ষ খেলোয়াড়, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার হাতিয়ার কারো হাতেই কিছু কম নেই, দুজনেই দুজনকে ইতিপূর্বে হারিয়েছেন, সুতরাং পাল্লা ছিল দুদিকেই সমান ভারী। সত্যি বলতে কী, প্রথম সেট বর্গ যখন জিতলেন, তখন আমরা এমনও ভাবছিলুম যে, এবারেও সম্ভবত বর্গই জিতবেন। কিন্তু তারপরেই চাকা

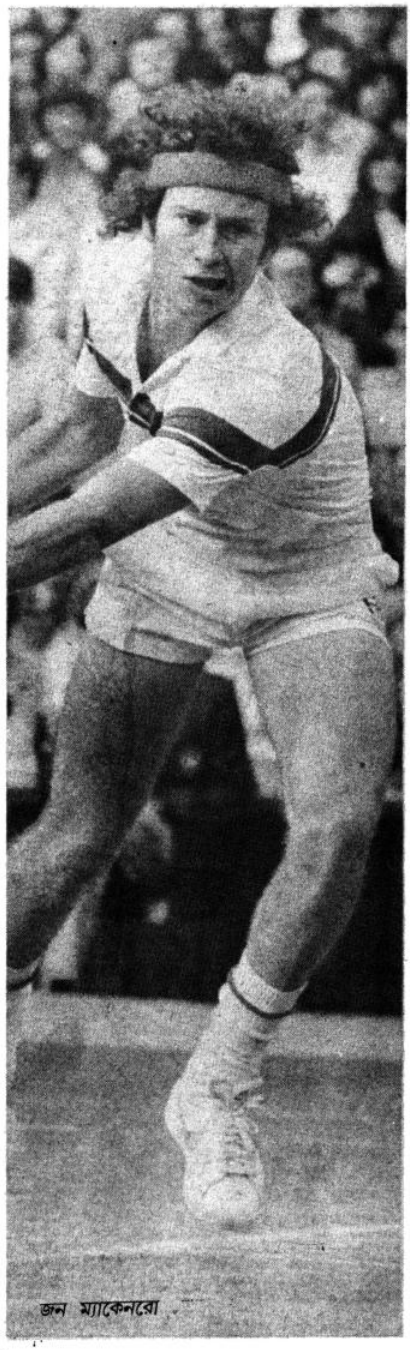

জন ম্যাকেনরো

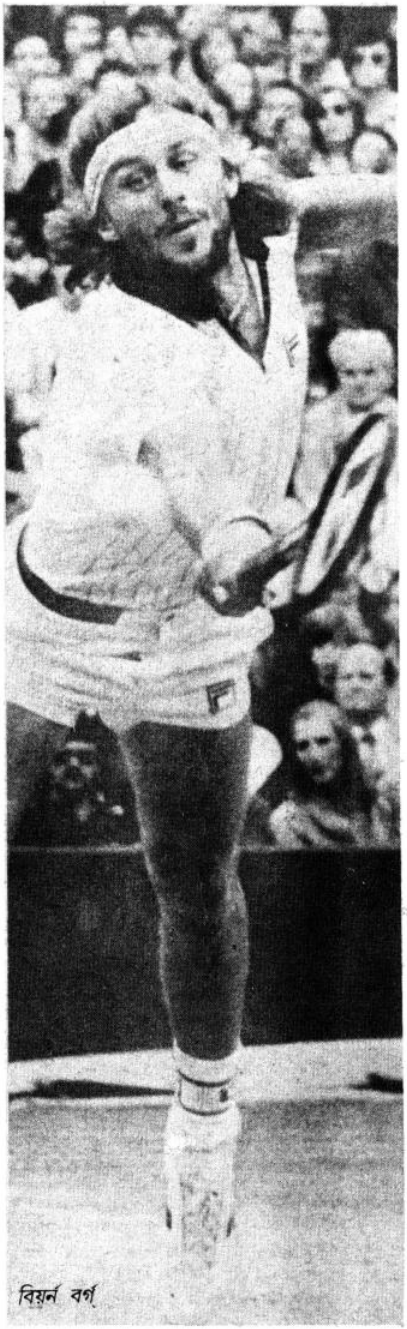

বিয়র্ন বর্গ

ঘুরল। খেলাটাকে বর্গ যখন শক্ত হাতে ধরতে চলেছেন, তখনই পালটে গেল ম্যাকেনরোর আক্রমণের ক্রীড়াকৌশল। আমরা দেখলুম, যে, তাঁর ব্যাকহ্যাণ্ড মারগুলো একেবারে চাবুকের মতো ঝলসে উঠছে, আর সেইসঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে টপস্পিনের তীব্রতা। ফলে বর্গের এলাকা থেকে ফেরার পথে একটার-পর-একটা বল এসে নেটের মধ্যে আটকে যেতে লাগল। তাঁর লবও তখন ম্যাকেনরোকে বিশেষ সমস্যায় ফেলতে পারছে না। দ্বিতীয় সেটটা চলে গেল ম্যাকেনরোর দখলে।

তৃতীয় সেটে বর্গ আবার হাতে তুলে নিতে চাইলেন খেলাটাকে। নিতে যে পারেননি, তাও নয়। এক সময়ে ৪-১ গেমেও এগিয়ে ছিলেন তিনি। কিন্তু ম্যাকেনরো সম্ভবত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, একবার যখন সমান-সমান হতে পেরেছেন, তখন এই তৃতীয় সেটকে তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না। শুধু তৃতীয় বলেই বা কথা কী, চতুর্থ সেটেও জন ম্যাকেনরোই জিতেছিলেন, এবং খেলাটাকে পাঁচ সেট পর্যন্ত গড়াতে দেননি।

আমরা অবাক হচ্ছিলুম ম্যাকেনরোর অনমনীয় মনোবল দেখে। এই জয় যে একটা হঠাৎ-প্রাপ্তির ব্যাপার নয়, বরং তাঁর অটল সংকল্প আর দুর্ধর্ষ রণকৌশলের পুরস্কার, তাতে সন্দেহ নেই। নিজের যোগ্যতার জোরেই তিনি জিতেছেন। যেমন প্রচণ্ড সার্ভিস, তেমনি ব্যাকহ্যাণ্ডের বাহাদুরি, ম্যাকেনরোর খেলায় সেদিন সত্যি কোনো খুঁত ছিল না। তার উপরে আবার এমনিতে যদিও তিনি একটু বদমেজাজি মানুষ, ফাইনালের দিনে তিনি কিন্তু রাগ-টাগ বিশেষ দেখাননি, বরং যথাসম্ভব ঠাণ্ডা মাথায় বর্গের আক্রমণের মোকাবিলা করেছেন।

ম্যাকেনরোর কথা থাক। বর্গকে হারানো মস্ত বাহাদুরির ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ম্যাকেনরোর পক্ষে সেটা নিশ্চয় এমন-কিছু নয়, যা কল্পনাই করা যায় না। সেই হিসেবে বরং অকল্পনীয় কাণ্ড ঘটিয়েছেন আমাদের বিজয় অমৃতরাজ। যাঁদের সীডেড খেলোয়াড় বলা হয়, তাঁদের তালিকায় এবারে বিজয়ের নামই ছিল না। অথচ, প্রায় অকল্পনীয় ভাবে, নামজাদা সব খেলোয়াড়দের সম্মানকে ধুলোয় নামিয়ে দিয়ে, এবারে তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে চলে এসেছি-

লেন। ১৯৭৩ সালে কোয়ার্টার ফাইনালে কোডেসের কাছে তাঁকে হারতে হয়েছিল। এবারে প্রথম রাউণ্ডেই বিজয় তাঁকে হারান। টীচারের বিরুদ্ধে এবারে তিনি যেভাবে জিতেছেন, সেটাও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম দুটি সেট জিতে নিয়ে কোনর্সকেও তিনি কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন, কিন্তু তারপরেই যে কী হল, বিজয়ের আর সেমিফাইনাল পর্যন্ত যাওয়া হল না।

না হোক, ভদ্র মেজাজের জন্য সকলের প্রশংসা পেয়েছেন তিনি। তোমরা হয়তো অনেকেই জানো যে, ব্যক্তিগতজীবনে বিজয় আর কোনর্স খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেদিনকার সেই নিদারুণ লড়াইয়ের সময়েও তাই একজনেরও মেজাজ নষ্ট হয়নি।

ভিটাস গেরুলাইটিসও মস্ত খেলোয়াড়। তিনিও এবারে বেশ হালকা মেজাজে ছিলেন তবে কিনা, সরাসরি কোনও সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ না-করলেও, আজেবাজে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে তিনি ছাড়েননি। একবার তে একটা ব্যাড লাইন কল-এর পরে চেয়ারে বসে আম্পায়ারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, বিড়বিড় করে তিনি বলতে থাকলেন, "ইয়েস স্যার হোয়াটেভার ইউ সে স্যার। ইউ আর নেভার রং স্যার। আই অ্যাম ব্যাক ইন দি আর্মি স্যার।' ইত্যাদি ইত্যাদি। তা আম্পায়ার এ-সব অতি-অমায়িক কথার তাৎপর্য বুঝলেন কিনা, কে জানে।

যাঁরা খেলা দেখতে চান, তাঁদের মুখেও নানা রকম মজার-মজার মন্তব্য শুনলুম। উইম্বলডনের টিকিট পাওয়া অতি শক্ত ব্যাপার; অল ইংল্যান্ড ক্লাবের বাইরে এই টিকিটের জন্যে রোজই মস্ত-মস্ত লাইন পড়ত। কিছু টিকিট আলাদা করে রাখা হয়েছিল প্রতিবন্ধীদের জন্য। তা লাইনে-দাঁড়ানো একটি ছেলেকে একদিন তার বন্ধুর উদ্দেশে বলতে শোনা গেল, "খেলা দেখবার জন্যে তুই তো খেপে গেছিস। তা একটা কাজ করতে পারিস? একটা হুইল চেয়ার জোগাড় কর; কাল তোকে সেই হুইল-চেয়ারে বসিয়ে এখানে নিয়ে আসব, তাহলে আর টিকিট পেতে কোনো অসুবিধে হবে না।"

বিজয় অমৃতরাজ

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা : গবা কি সত্যিই পাগল ? উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধববাবুর পায়ের কাছে বোমা ফাটে, উড়ো চিঠিতে তাঁকে শাসানো হয়। উদ্ধবের ছেলে রামুর গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খান। গবার ঘরে মাঝরাত্তিরে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। সারকাসের রহস্যময় লোকটিই হরিহর পাড়ুইয়ের খুনের মামলার ফেরারি আসামি গোবিন্দ মাস্টার কি না, তা জানবার জন্য গোপনে তাঁবুতে ঢুকে দারোগাবাবু আক্রান্ত। গোপন আস্তানায় গোবিন্দর সঙ্গে রামুর দেখা হয়। আস্তানায় আগুন লাগে। এদিকে কাকাতুয়া বেহাত। দুঃখে উদ্ধববাবু আত্মহত্যা করতে যাচ্ছেন, এমন সময়....

॥ ১৯ ॥

গলায় তরোয়ালের ধারালো দিকটা চেপে ধরে উদ্ধববাবু চোখ বুজে দুর্গানাম স্মরণ করে বিড়বিড় করে বললেন, "দুর্গে দুর্গতিনাশিনী মাগো ! সন্তানকে কোলে তুলে নাও মা। দেখো, যেন বেশি ব্যথা-ট্যথা না পাই, রক্তপাত যেন বেশি না হয়। মরার পর যেন ভূত-টুত হয়ে থাকতে না হয়। সব দেখো মা !" বলতে বলতে তরোয়ালটায় একটু চাপ দিয়েছেন।

আত্মহত্যার বিভিন্ন পন্থা নিয়ে চিন্তা করতে করতেই উদ্ধববাবু শোওয়ার ঘরে ঢুকেছিলেন। তরোয়ালটা হাতেই ছিল। রক্ত না খাইয়ে সেটাকে খাপে ভরা বারণ। সুতরাং তিনি চটপট স্থির করে ফেললেন, এক কাজে দুই কাজ সেরে ফেলাই ভাল।

কে যেন খুব কাছ থেকে বলে উঠল, "বাবামশাই, লুচি খাব।"

উদ্ধববাবু চোখ খুললেন। অবাক হয়ে দেখলেন, উত্তর দিকের জানালার গরাদ দিয়ে কাকাতুয়াটা সেঁধিয়ে ঘরে ঢুকছে। টালুক-টুলুক করে দেখছে তাঁকে। চোখে চোখ পড়তেই বলল, "সব ভাল যার শেষ ভাল।"

উদ্ধববাবু তরোয়াল রেখে দিয়ে কাকাতুয়াটাকে বুকে তুলে নিয়ে আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেললেন। ধরা গলায় বললেন, "তোর জন্যেই এ-যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেলাম বাপ, কত লুচি খেতে চাস? তোকে ফাঁসির খাওয়া খাওয়াব।" বলে ভিতর-বাড়ির দিকে মুখ করে হাঁক দিলেন, "ওরে নয়নকাজল, শিগগির লুচির জন্য ময়দা মাখ।"

কিন্তু নয়নকাজল তখন ময়দা মাখার মতো অবস্থায় তো আর নেই। বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে একটা জঙ্গলের মধ্যে সে মাটির ওপর চিত হয়ে শুয়ে আছে। তার বুকের ওপর দানবের মতো একখানা পা রেখে দাঁড়িয়ে সাতনা। গলায় বল্লমটা চেপে ধরে সাতনা বলছে, "প্রাণে বাঁচতে চাস তো সত্যি কথা বল।"

ভয়ে নয়নকাজলের বাক্যি হরে গেছে। দোষটা অবশ্য তারই। পরশুদিনই একটা লোক তার মামাতো ভাই সেজে এসে তাকে দুশো টাকা দিয়ে বলে গেছে, "আমরা ঠিক সময়মতো আসব। উদ্ধব বাধা দেবে দিক। তুই পাছ-দুয়ার দিয়ে পাখিটা বের করে দিবি।" নয়নকাজল সে প্রস্তাবে রাজি হয়নি। পাখি গুপ্তধনের সন্ধান জানে। এমন পাখি হাতছাড়া করার জন্য মাত্র দুশো টাকায় রফা করে কোন্ আহাম্মক ! সে পষ্টাপষ্টি বলে দিল, "ওসব হবে না। আমাকে ভাগ দিতে হবে। পাখি নিয়ে আমি তোমাদের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ব।"

সেই কথাই ঠিক ছিল। ডাকাতরা বাড়ি ঢুকতেই নয়নকাজলও পাখিটাকে দাঁড় থেকে খুলে র‍্যাপারে চাপা দিয়ে পাছ-দুয়ার খুলে বেরোয়। তারপর সবাই মিলে হাঁটা দিয়েছে জঙ্গলের দিকে। কিন্তু কাকাতুয়া খুব ছোটখাটো পাখি তো নয়। বেশ বড়সড়, আর ওজনও অনেকটা। জঙ্গলের কাছ-বরাবর এ-বগল থেকে ও-বগলে নেওয়ার সময় পাখিটা হঠাৎ ঝাপটা মেরে উড়ে গেল।

নয়নকাজল সাতনার দিকে চেয়ে চিঁ-চিঁ করে বলল, "মাকালীর দিব্যি বলছি, হাতটায় ঝিঁ-ঝিঁ ধরেছিল বলে, ইচ্ছে করে ছাড়িনি।"

দলের ষণ্ডামতো আর-একটা লোক সাতনাকে ডেকে বলল, "এক্ষুনি মারিস না। ওটাকে দিয়ে কাজ হবে।"

সেই লোকটা এসে সাতনাকে সরিয়ে নয়নকাজলকে টেনে দাঁড় করাল। তারপর দু-গালে ফটাস ফটাস করে দুখানা চড় মেরে বলল, "আবার যা। এবার শুধু পাখি নয়, উকিলের ছোট ছেলেটাকেও চুরি করবি। উকিলটা মহা ত্যাঁদড় আছে। থানা-পুলিশ করতে পারে। ছেলেটা আমাদের হাতে থাকলে তা আর করতে সাহস পাবে না।" চড় খেয়ে নয়নকাজলের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত ঝিনঝিন করছিল। সে কোনো মতে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। সাতনা তার গলায় বল্লমটা আবার ধরে বলল, "শোন্ বাপু, গুপ্তধনের ভাগ চাস, সে অনেক বড় কথা। কিন্তু এখন প্রাণ বাঁচানোর জন্যই ঠিক ঠিক কাজ করিস। একটু গুবলেট হলে যমদোরে গিয়েও আমাদের হাত থেকে বাঁচার উপায় নেই। মনে থাকবে?"

নয়নকাজল মাথা নাড়ল। একটু দম নিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

বাড়ি পৌঁছুতে ফর্সা হয়ে গেল চারদিক। উদ্ধববাবুর হুংকারে পাড়া কাঁপছে। "কোথায় গেল সেই পাজি ছুঁচোটা? সেই তখন থেকে কাকাতুয়া লুচি-লুচি করে হেদিয়ে মরছে!"

নয়নকাজল হাঁফাতে হাঁফাতে উদ্ধববাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। "আজ্ঞে বাবামশাই, ধরতে ধরতেও ধরতে পারলাম না। একটুর জন্য..."

উদ্ধববাবু নয়নকাজলের উড়োখুড়ো চেহারা দেখে আঁতকে উঠে বললেন, "কাকে ধরতে পারলি না?"

"দলে পাঁচ জন ছিল। হাতে ইয়া বড় দা, বন্দুক, কুড়ুল, বল্লম। তা ভাবলাম, যার নুন খাই তার জন্য নাহয় প্রাণটা দেব। পাখিটা চুরি করে যেই না তারা পালাচ্ছে, আমিও লাঠি নিয়ে পিছু ধরলাম। মাইলটাক পর্যন্ত দৌড়ে ধরেও ফেলেছিলাম প্রায়। কিন্তু ভয় খেয়ে তারা এমন ছুটতে লাগল যে, একটুর জন্য..."

উদ্ধববাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, "হুম্। ঠিক আছে, এখন গিয়ে দু'সের ময়দা মাখ্ ভাল করে। ডাকাতদের ব্যবস্থা আমি করছি।"

নয়নকাজল উদ্ধববাবুর কাঁধে বসা পাখিটার দিকে কটমট করে একবার চেয়ে ময়দা মাখতে গেল। (ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

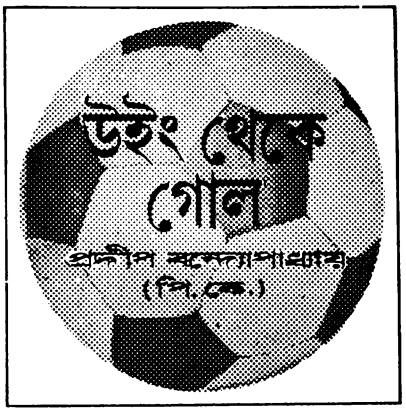

॥ ২৬ ॥

সাতান্ন'র কলকাতা ফুটবল লীগ শুরুর আগেই ভারতীয় দল দূর-প্রাচ্য সফরে গিয়েছিল। মেলবোর্ন অলিম্পিকে নির্বাচিত হননি, এমন কয়েকজনও দলে জায়গা পেলেন। সুশীল গুহ, চন্দন সিং, ইয়ামানি ছাড়াও দলে এলেন গোলকীপার এস (ফিশে) চ্যাটার্জি।

প্রথম ম্যাচ রেঙ্গুনে। নেভিল ডিসুজা হ্যাটট্রিক করায় আমরা ৩—১ গোলে এগিয়ে গেলাম। আমার সেন্টারে ভলিতে ইনস্যুইং করিয়ে নেভিল যেভাবে দ্বিতীয় গোলটি করলেন, তা এক কথায় অনবদ্য। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই খেলা ৩—৩ হয়ে গেল। আমি গোল করে আবার দলকে এগিয়ে দিলাম। কিন্তু তাতেও কিছু হল না, খেলা ৪—৪ গোলে ড্র হয়ে গেল।

আমরা কেন এত গোল খেলাম জানো? গোলকীপার এস চ্যাটার্জি কিছুতেই বাঁ হাত তুলছিলেন না। বাঁ দিকের উপরের বলও তিনি ডান হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করছিলেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রেঙ্গুন একাদশের ফরোয়ার্ডরা একের পর এক বাঁ দিক দিয়েই উঁচু শট করার চেষ্টা করলেন।

পরে শুনলাম, কাঁধে চোট থাকায় ফিশেদা বাঁ হাত তুলতে পারছিলেন না। কোচ বাঘা সোমের সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁকে কলকাতায় ফেরত পাঠানো হল। কিন্তু নারায়ণ ছাড়া আর কেউ না থাকায় আর-একজন গোলরক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করলাম।

দ্বিতীয় ম্যাচে বার্মা একাদশকে ৪—২ গোলে হারাতে আমাদের কোনো অসুবিধাই হল না। নেভিল ডিসুজা অনায়াসে আর একটি হ্যাটট্রিক করলেন। চতুর্থ গোলটি এল আমার বাঁ পায়ের শটে।

খেলার পর এক দিকপাল ফুটবলার আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। বললেন, "কলকাতায় খেলে আমি যা আনন্দ পেয়েছি তার তুলনা নেই। কলকাতার দর্শকদের মতো সমঝদার তো আর কোথাও দেখলাম না!"

তোমরা যারা পুরনো দিনের খবর রাখো, তাদের কাছে পাগ্‌স্‌লে নামটা নিশ্চয় অচেনা নয়। একদা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে তিনি দাপটের সঙ্গে খেলে গেছেন। পাগ্‌স্‌লে আমাদের প্রত্যেককে একটি করে সুন্দর কাঠের অ্যাশট্রে উপহার দিলেন।

রেঙ্গুন থেকে হংকং। হংকংয়ে প্রথম খেলার দিন সকালে আমরা সকলেই চমকে গেলাম। ব্রেকফাস্ট সারছি, হঠাৎ দেখি—ডাইনিং রুমের দরজা দিয়ে হাসি মুখে ঢুকছেন গোলকীপার এস চ্যাটার্জি। দুদিন আগেই যিনি রেঙ্গুন থেকে কলকাতা ফেরত গেলেন, তিনি এখানে কীভাবে? ফিশেদার এক হাতে বিরাট স্যুটকেস, অন্য হাতে একটা কাগজ। নাটকীয় ভঙ্গিতে সেই কাগজটি তিনি বাঘাদার হাতে দিলেন। বাঘাদার মুখ থমথমে। ঐ কাগজটি আসলে একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট—যাতে লেখা আছে, এস চ্যাটার্জি সম্পূর্ণ সুস্থ, খেলার কোনো অসুবিধা থাকতে পারে না। ফিশেদার ক্লাব মোহনবাগানের কর্তারা এই সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করেন। এক বিখ্যাত ডাক্তার ফিশেদাকে পরীক্ষা করে লিখে দিয়েছেন, হাত নিয়ে তাঁকে আর কোনো অসুবিধায় পড়তে হবে না। সার্টিফিকেটে যে ডাক্তারের সই ছিল, তাঁর ওপর আর কারও কিছু বলার ক্ষমতা ছিল না। তোমরা নিশ্চয় জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, কে সেই বিখ্যাত ডাক্তার? তিনি হলেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়!

ফিশেদা ছিলেন খুবই রসিক লোক। তাঁকে ফিরে পেয়ে সকলেই খুশি হলাম। সৌভাগ্যবশত, এই সফরে তাঁকে নিয়ে টীমকে আর অস্বস্তিতে পড়তে হয়নি।

হংকংয়ে প্রথম ম্যাচে আমরা ৩—১ গোলে

সাতান্ন'র দূরপ্রাচ্য সফরে ভারতীয় দল। মালা গলায় অধিনায়ক সমর ব্যানার্জি। বসে, ডান দিকে তৃতীয়, প্রদীপ

জিতলাম। হংকং চীনা একাদশ যথেষ্ট শক্তিশালী দল, ওদের কোচ ছিলেন বিখ্যাত চীনা ফরোয়ার্ড লি ওয়াই টঙ। আমরা প্রথম দিনেই দর্শকদের চমৎকৃত করলাম। হংকংয়ের সমস্ত পত্রিকায় ভারতীয় দলের প্রশংসা দারুণভাবে করা হল। আমি একটা গোল করেছিলাম। প্রথম দিনেই হংকংয়ের 'সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট' পত্রিকায় আমাকে বলা হল 'স্পীড মার্চেন্ট'।

একই দলের সঙ্গে পর পর তিনটি ম্যাচ খেলার কথা। দ্বিতীয় ম্যাচেও আমরা জিতলাম, তবে কোনোরকমে এক গোলে। একমাত্র গোলটি করার সৌভাগ্য আমারই হয়েছিল।

এবার হংকংয়ের চীনা একাদশের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচ। ওদের সকলেই পেশাদার ফুটবলার। পর পর দুটি ম্যাচ হারায়, তৃতীয় ম্যাচে জেতার জন্য ওরা বদ্ধপরিকর ছিল। তবু, রেফারির সহায়তা না পেলে এই ম্যাচেও চীনা দল জিততে পারত কিনা সন্দেহ। খেলা যখন ১—১, আমাদের লেফ্‌ট ব্যাক সুশীল ওদের সেন্টার ফরোয়ার্ডকে চমৎকার ট্যাকল করলেন। দুজনেই পড়ে গেলেন। কিন্তু রেফারির সিদ্ধান্ত হল অদ্ভুত। তিনি আমাদের বিরুদ্ধে পেনালটির নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, সুশীল গুহকে মাঠ থেকে বহিষ্কারও করলেন। প্রতিবাদ জানিয়েও কোনো ফল হল না। এর পর দশজনে দায়সারাভাবে খেলায় আরও দুটো গোল খেতে হল। তবে খেলা শেষ হওয়ার কয়েক মিনিট আগে আমার সেন্টার থেকে পরিবর্ত সেন্টার ফরোয়ার্ড কেষ্ট পাল একটা গোল শোধ করলেন। আগের দুটি ম্যাচে নেভিল ডিসুজা হ্যাটট্রিক করেছিলেন। কিন্তু নেভিলের খেলা এক দিক দিয়ে কোচ বাঘাদার মোটেই পছন্দ ছিল না—নেভিল বেশ নরম ধাতের ফুটবলার ছিলেন। লড়িয়ে কেষ্ট পালই এর পর থেকে সেন্টার ফরোয়ার্ডের জায়গায় এসে গেলেন, মনমরা নেভিলকে অধিকাংশ সময় কাটাতে হল মাঠের বাইরে।

কুয়ালালামপুরে প্রথম ম্যাচে মালয়ের চ্যাম্পিয়ন দল মেলাহুরকে অতি সহজেই ৩—১ গোলে হারিয়ে দিলাম। আমি প্রথম গোল করার পরে দুটি গোল করলেন কিট্টু এবং কেষ্ট পাল। খেলার পরদিন, ১১ ফেব্রুয়ারির মালয় মেইল পত্রিকায় হেডলাইন ছিল : 'পি কে ব্যানার্জি একাই টিকিটের দাম উসুল করে দিয়েছেন!' ঐ পত্রিকার ক্রীড়াসাংবাদিক ছিলেন এককালের বিখ্যাত ফুটবলার। পেপার-কাটিংয়ের ফাইল খুলে দেখছি, একুশ বছর বয়সী ফুটবলারটি সম্পর্কে তিনি প্রায় বিশ লাইন জুড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এক জায়গায় লিখেছেন : "আমার ফুটবলার বা সাংবাদিক জীবনে এত ভাল উইঙ্গার আমি দেখিনি।"

কুয়ালালামপুরে দ্বিতীয় ম্যাচে মালয় একাদশের বিরুদ্ধে আমরা জিতলাম ৩—২

গোলে। প্রথম গোল এইদিনও আমার পা থেকে এল। ভারতীয় দলের হয়ে পরের দুটি গোল করলেন ইয়ামানি এবং নেভিল ডিসুজা (পেনালটি)।

দ্বিতীয় ম্যাচে স্থানীয় ভারতীয়রা আমাদের কাছে হারলেন ৫—১ গোলে। একাধিক চমৎকার গোল করলেন কে পাল। কেষ্ট পালের বলের ওপর দখল খুব ভাল ছিল না। কিন্তু দুটি জিনিস দারুণ ছিল—ডান পায়ের শট এবং হেডিং। তিনি কত ভাল গোলগেটার ছিলেন, একটা উদাহরণ দিলেই তা বুঝতে পারবে। স্বনামধন্য সাহু মেওয়ালালকে টপকে তিনি কলকাতা লীগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছিলেন, ভবানীপুর ক্লাবে খেলেও! পরবর্তীকালে মোহনবাগানের সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবেই অবশ্য কে পাল অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

দুদিনই মাঠে হাজির ছিলেন মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুর রহমান। প্রচণ্ড ফুটবল-অনুরাগী টুঙ্কু এশিয়ার ফুটবলের উন্নতির জন্য যা করেছেন, তা সকলেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। টুঙ্কুর কাছ থেকে কোনোরকম অনুগ্রহ পেতে গেলে ফুটবল সম্পর্কে জ্ঞান এবং উৎসাহ খুব জরুরি ছিল।

সেই সময়ে তিনি চেষ্টা করছিলেন তাঁর দেশকে ফুটবলে শক্তিশালী করতে। দ্বিতীয় ম্যাচের পর, সন্ধ্যায় তিনি ভারতীয় ফুটবলারদের সম্মানে এক নৈশভোজের ব্যবস্থা করলেন। অবাক হয়ে শুনলাম, তিনি বক্তৃতা করছেন: ভারতীয় বন্ধুরা দুদিনই আমাদের চমৎকার ফুটবল দেখালেন। আমরাও এইরকম ফুটবল খেলতে চাই। অবিলম্বে চেষ্টা শুরু করতে চাই। ভারতীয় দলের রাইট উইঙ্গার ছেলেটির খেলা আমার বড্ড ভাল লেগেছে। ওকে কি আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যেতে ভারতীয় কর্তারা রাজি আছেন?

আমরা সকলেই বুঝলাম, কথার কথা। হালকা মেজাজে তিনি আমার প্রশংসা করলেন। কিন্তু দু বছর পরে ১৯৫৯ সালে মারদেকা ফুটবল খেলতে গিয়ে বুঝলাম, ওটা কথার কথা ছিল না। সে আর এক গল্প।

(ক্রমশ)

ভবিষ্যতের ভার

কিছুদিন আগে কলকাতার পথে ঘাটে ছড়িয়ে থাকা পুরোনো দিনের দু-একটা জিনিসের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি কাড়তে চেয়েছিলাম।

এবারে বলবো কতগুলো পুরোনো অথচ ঐতিহাসিক বাড়ির কথা। যেসব বাড়ির প্রতিটি ইট-কাঠের সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কলকাতার বহু অজানা ইতিহাস।

যেমন ধর রাইটার্স বিল্ডিংস্। ১৭৭৬ খৃঃ ১৮ই নভেম্বর রাইটার-দের অর্থাৎ ইংরেজ কর্মচারীদের আবাসগৃহ রাইটার্স বিল্ডিংস্ তৈরী হয়। বর্তমান বাড়িটি ২৩৫ গজ চওড়া এবং মোট তেরোটি চারতলা বাড়ির সমষ্টি। একহাজার ঘর আছে এখানে। মোট ২·৮ একর জমির ওপর অবস্থিত। দশ একর হ'ল মেঝের ভূমির পরিমাণ। প্রায় ছ'হাজার লোক এখানে কাজ করেন। বহুমূল্যবান রেকর্ড জমা আছে এই বাড়িতে।

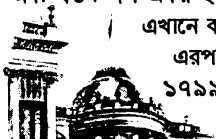

এরপর আসছি রাজভবনের কথায়। এর নির্মাণকার্য শুরু হয় ১৭৯৯ খৃঃ ৫ই ফেব্রুয়ারী। ১৮০৪ খৃঃ বাড়িটি তৈরী শেষ হয়। জমি, বাড়ি তৈরী ও আসবাব নিয়ে রাজভবন তৈরীর খরচ পড়েছিল তখনকার দিনে তেরো লক্ষ টাকা। বর্তমানে ৩০ একর জমির ওপর তৈরী এই প্রাসাদের কক্ষ সংখ্যা ১৩৭টি।

তোমাদের এসব কথা জানানোর উদ্দেশ্য শুধু একটাই। সেটা হ'লো নিজেদের শহরটা সম্পর্কে ছোটদের সচেতন করে তোলা। দিন বদলাচ্ছে। অনেক পুরোনো জিনিস কালের নিয়মে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা যাবে। কিন্তু মাত্র ৩০০ বছর বয়স হলেও এই শহরটার যে অনেক বড় ইতিহাস আছে সেটা যেন তোমরা ভুলে যেও না। কারণ ভবিষ্যতের কলকাতার নাগরিকদের শহরটাকে চিনিয়ে দেবার ভার তো তোমাদের ওপরেই রয়েছে।

এরপরে অন্য আরও কতগুলি ঐতিহাসিক বাড়ি সম্পর্কে তোমাদের জানাবো। তোমরাও এবিষয়ে কতটা কি জান তা চিঠি লিখে জানিও কিন্তু।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম. ডি. এ., ৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

মহারাজের দেওয়ালি

সুব্রত নিয়োগী

মহারাজের আজ ইস্কুলে যেতে একেবারে ইচ্ছে করছিল না। আর কদিন বাদেই পুজো। পুজোর কদিন এবার ও পাড়ার পুজো-প্যাণ্ডেলে রাত জাগবে ঠিক করেছে। বাবা বলেছেন, তেরো বছর বয়স হলে পুজো-প্যাণ্ডেলে বন্ধুদের সঙ্গে রাত জাগতে দেবেন। তেরো বছর হতে মহারাজের আর সাতদিন বাকি আছে। ইস্কুলে না যাবার আরও একটা কারণ, অধিকারী-স্যারের পড়া আজ ভাল করে তৈরি হয়নি। বাংলার স্যার অধিকারীবাবু ভীষণ রাগী স্যার। একদিনের ঘটনা মনে পড়ে মহারাজের। ক্লাসে 'জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর' রচনা লিখতে দিয়েছিলেন অধিকারী-স্যার। মহারাজ দারুণ লিখেছিল রচনাটি। কিন্তু একেবারে শেষ লাইনে লিখেছিল—সুতরাং, জীব-জন্তুকে আমাদের ঘৃণা করা উচিত নয়, তাদের আদর করে কোলে তুলে নেওয়া উচিত। অধিকারী-স্যার শেষ লাইন দুটো দেখে এমন চটে গেলেন যে, মহারাজকে কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে কান মলে দিয়ে বলেছিলেন, ঘিয়ে-ভাজা কুকুরকে আমাদের কোলে তুলে নিতে হবে। অ্যাঁ, যত্তোসব।

তাছাড়া ইস্কুলে গিয়ে রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। এও একটা কারণ ইস্কুলে যেতে না চাওয়ার। রঞ্জনের সঙ্গে মহারাজের ঝগড়া হয়ে গেছে সেদিন সামান্য কারণে। অথচ মহারাজের খুব ইচ্ছে করছে রঞ্জনের সঙ্গে কথা বলে।

কিন্তু মায়ের বকুনি খেয়ে মহারাজকে ইস্কুলে যেতেই হয়। ইস্কুলে গিয়ে দেখে, রঞ্জন সুন্দর একটা বল-পেন এনেছে। তাতে চারটে রঙ। কালো, ম্যাজেন্টা, নীল আর সবুজ। পেছন দিকের বোতাম টিপলে এক-এক রঙের নিব বেরিয়ে পড়ে। মহারাজের ভারী ইচ্ছে করছিল টিফিনের সময় রঞ্জনের কাছে গিয়ে বল-পেনটা দেখে। কিন্তু কেমন যেন বিচ্ছিরি লাগছিল।

নির্ম্মল শ্বাস-প্রশ্বাস...
সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিন্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দু'ইই দূর করে।

ফলাফল: সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN

রঞ্জনের সঙ্গে ওর খুব ভাব। পাশাপাশি বাড়িতে থাকে। কিন্তু রঞ্জন ওকে বল-পেনটা না দেখিয়ে আর সবাইকে দেখাচ্ছে, ভাবতেই পারে না মহারাজ।

টিফিনের সময় রঞ্জনকে ঘিরে আছে ছেলেরা। রঞ্জনটার কেমন অহঙ্কার হয়েছে। আড়চোখে দেখছে মহারাজকে। মহারাজের গলার ভেতর কিসের একটা দলা এসে আটকে আছে যেন। দারুণ কান্না পাচ্ছে।

জ্যামিতি ক্লাসে পড়া বলতে পারেনি রঞ্জন। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। রঞ্জন পড়া বলতে না পারায় ভারী খুশি হয়েছে মহারাজ। ইচ্ছে করছিল, আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে।

দেখতে-দেখতে পুজোর ছুটি এসে গেল। রঞ্জনের সঙ্গে তখনও ভাব হয়নি মহারাজের। পুজোর সময় পাড়ার প্যাণ্ডেলে অনেকবার মুখোমুখি হয়েছে। স্নান করে নতুন জামা-কাপড় পরে অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দিয়েছে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তবুও কথা বলেনি রঞ্জন। বুজুমের সঙ্গে আলুকাবলি আর চুড়মুড় খেতে চলে গিয়েছে। কিসের যে এত অহঙ্কার রঞ্জনের। হাফ-ইয়ার্লিতে অঙ্কে ওর চেয়ে পাঁচ নম্বর বেশি পেয়েছিল। এবার দেখা যাবে অ্যানুয়ালে। সারা পুজোর ছুটিতে দুটো মোটা খাতা শেষ করল মহারাজ অঙ্ক করে।

পুজো শেষ হতেই কালীপুজো এসে গেল। রাতের দিকে একটু-একটু শীত করে যেন। সন্ধের দিকে মহারাজের মা হালকা একটা সোয়েটার পরিয়ে দেন মহারাজকে। সামনেই পরীক্ষা, যাতে হিম-টিম না লাগে।

কালীপুজোর ঠিক আগের দিন মহারাজের বাবা বাড়িতে একটা টেপ-রেকর্ডার আনলেন হঠাৎই। কী সুন্দর সবুজ কলাপাতা রঙের টেপ-রেকর্ডারটা। পাশাপাশি দুটি চাকা। ফুর-ফুর শব্দে ঘোরে চাকা-দুটো। মহারাজের বাবা নানারকম সুইচ টিপে টেপ-রেকর্ডারটা কীভাবে চালায়, কীভাবে বন্ধ করে দেখাচ্ছিলেন। টেপ-রেকর্ডারে মহারাজের মা খালি গলায় অতুলপ্রসাদের একটা গান রেকর্ড করে রাখলেন। মহারাজ গলার আওয়াজ উঁচু করে নিচু করে আবৃত্তি করল রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ'। মহারাজের বাবা মহাত্মা গান্ধীর 'মাই এক্সপেরিমেন্ট উইথ ট্রুথ' থেকে ইংরেজিতে একটা প্যারা পাঠ করলেন।

নিজের গলার আওয়াজ শুনে নিজেরই অবাক লাগল মহারাজের। যেন গলাটা তার নিজের নয়, এমন মনে হল।

মহারাজের বাবা যত্ন করে টেপ-রেকর্ডার কীভাবে চালাতে হয় শিখিয়ে দিলেন মহারাজকে। কিছুক্ষণের মধ্যে টেপ-রেকর্ডার চালানোর সমস্ত কায়দা-কানুন শিখে ফেলল মহারাজ। কীভাবে রেকর্ড করতে হয়। কীভাবে শোনাতে হয় সেটা।

সব শিখে যাবার পর মহারাজকে অবাক করে দিয়ে মহারাজের বাবা বললেন, "এই টেপ-রেকর্ডারটা তোমাকে দিলাম মহারাজ।

পার্থসারথি চক্রবর্তীর
বই মানেই
মজার বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের মজা

বিজ্ঞানের রহস্যের প্রতি কিশোর-মনকে আকৃষ্ট করার মতো নির্ভরযোগ্য বই বাংলা ভাষায় খুব কমই প্রকাশিত হয়। পার্থসারথি চক্রবর্তী শুধু যে সেই অভাবই পূরণ করে চলেছেন তাই নয়, বিষয়কে সরস এবং মজাদার, কৌতূহলকর এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে হয় কোন্ জাদুতে, তাও তাঁর অজানা নয়। গল্পচ্ছলে তিনি শেখান বিজ্ঞানের নানান গভীর তত্ত্ব ও বিজ্ঞান নিয়ে হরেক মজার খেলা, বুদ্ধিকে শান দেবার মতো দারুণ দারুণ সব মজা দেন উপহার। ছোটদের মহলে তাঁর বই নিয়ে তাই হইচই পড়ে যায়।

পার্থসারথি চক্রবর্তীর বই

কেমিক্যাল ম্যাজিক	৫·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা	৫·০০
রসায়নের ভেলকি	৪·০০
ম্যাজিকের মত মজা	৫·০০
তত সহজ ছিল না	৫·০০
মজার এক্সপেরিমেণ্ট	৫·০০
বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা	৬·০০

আরো অনেক বই

বিমল করের : ওআগুার মামা ৭·০০ কাপালিকরা এখনও আছে ৮·০০ রাজবাড়ির ছোরা ও হারানো জীপের রহস্য ১২·০০ অলৌকিক ১০·০০ **মনোজ বসুর :** ওস্তাদ নটবর ৬·০০ **শিশির করের :** গঙ্গায় বাঘ ৪·০০ **শেখর বসুর :** সোনার বিস্কুট ৮·০০ **লীলা মজুমদারের :** বাতাসবাড়ি ৬·০০ কাগ নয় ১০·০০ **সমরজিৎ করের** অগ্রজ বিজ্ঞানী ১৫·০০ **অমরনাথ রায়ের :** দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১২·০০ **আশাপূর্ণা দেবীর :** রাজকুমারের পোশাকে ৫·০০ গজ উকিলের হত্যা-রহস্য ৮·০০ **সমরেশ বসুর :** মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৬·০০ বন্ধ ঘরের আওয়াজ ১০·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

লেখা-পড়া তৈরি করতে এটা তোমার খুব কাজে লাগবে। বিদেশে আজকাল ছোট-ছোট টি ভি সেট নিয়ে ছেলেরা একা-একাই পড়াশুনো করছে।"

মহারাজের বাবা আরও বললেন, "এবার দেওয়ালিতে বেশি বাজি-টাজি পুড়িও না। আগুন-টাগুন লেগে একটা কাণ্ড ঘটে যাবে কখন।"

"না, না বাবা, আমার কোনো বাজি লাগবে না এ-বছর।" মহারাজ চোখে ঝিলিক তুলে বলল।

আসলে মহারাজ মাথায় অন্য একটা মতলব আঁটছিল। টিফিনের পয়সা জমিয়ে সে অনেক আগেই একটা চকোলেট-বোমা কিনে রেখেছে।

কালীপুজোর দিন সন্ধে হতে না হতেই ছুটে চলে গেল মহারাজ। পাশের বাড়ির ছাদে রঞ্জন নানারকম বাজি পোড়াচ্ছে। চারপাশে ওর দাদা-দিদি আর কাকুরা ভিড় করে আছে। হাত-চরকি, বসন-চরকি, তুবড়ি, রঙমশাল, হাউই। একটা হাউই আকাশে ছুটে গিয়ে রঙিন ফানুস হয়ে দুলতে থাকে। কোনোটা বা আকাশে উড়ে গিয়ে তারপর ফেটে পড়ছে। পেট থেকে বেরিয়ে পড়ছে ঝলমলে এক আলোর মালা। সেই আলোর ছটায় আকাশের সব কিছু স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মহারাজ অবাক হয়ে সে-সব দেখছিল।

এক সময় রঞ্জনের সব বাজি পোড়ানো হয়ে গেলে মহারাজ আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইল রঞ্জনদের বাড়ির ছাদ থেকে আর কোনো বাজি পোড়ে কি না দেখার জন্য। যখন দেখল আর কোনও শব্দ নেই, আর কোনও আলো নেই তখন সে চুপিচুপি চিলেকোঠার ভেতরে ইলেকট্রিক প্লাগে টেপ-রেকর্ডারের লম্বা তার লাগিয়ে টেপ-রেকর্ডারটা ছাদের পাঁচিলের ধারে লুকিয়ে রাখল। রঞ্জন ছাদে দাদা-দিদিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রাস্তায় বাজি পোড়ানো দেখছে। আকাশে মাঝে মাঝে দু-চারটে হাউই সোঁ-সোঁ করে ছুটে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময়ে ছাদের এক কোণে চকোলেট-বোমার সাদা পলতেতে আগুন দেয় মহারাজ। প্রচণ্ড শব্দে চারিদিক কেঁপে ওঠে।

সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফাটানোর আওয়াজ টেপ-রেকর্ডারে রেকর্ড হয়ে যায়। তারপর থেকে বার বার মহারাজ টেপ-রেকর্ডারে চকোলেট বোমা ফাটাতে থাকে। অবিকল সত্যিকারের বোমার শব্দ।

রঞ্জনদের বাড়ির ছাদ থেকে সবাই এদিকে তাকিয়ে থাকে। মহারাজ কত চকোলেট-বোমা ফাটাচ্ছে দেখে একটু হিংসে হয় রঞ্জনের। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বোমা ফাটায় মহারাজ। রঞ্জনকে সে হারিয়ে দেবেই। কিছুতেই জিততে দেবে না।

সেদিন থেকে রঞ্জনকে আর ছাদে দেখতে পায় না মহারাজ।

তবে কালীপুজোর তিন দিন পরে ইস্কুল খুললে রঞ্জনই আগে কথা বলে মহারাজের সঙ্গে। "উরেব্বাস, তুই কত বোমা কিনেছিলি সেদিন মহারাজ।"

"না, না, সব বোমা আমার টেপ-রেকর্ডার ফাটিয়েছে রে।" বলে হি-হি করে হাসতে থাকে মহারাজ।

রঞ্জন তখন চোখ কপালে তুলে বলে, "সে কী রে।"

মহারাজ তখন রঞ্জনকে সব ঘটনা খুলে বলে।

তা শুনে রঞ্জনও হাসতে থাকে। দুজনের হাসি শেষ হতে না হতেই তারা দেখে, অধিকারী-স্যার ক্লাসে ঢুকছেন। রঞ্জন আর মহারাজ উঠে দাঁড়ায়। অধিকারী-স্যার চেয়ারে বসলে তারাও বসে পড়ে।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

যেখানেই যান, যে-কাজই করুন
স্বাচ্ছন্দ্যময় চলা-হাঁটার উপরই
নির্ভর করছে আপনার সাফল্য।

রাজুর তৈরী টেকসই গেঞ্জী,জাঙ্গিয়া,
মোজাই আপনাকে জোগাতে পারে
সেই বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য, এবং কম
খরচে। কেনার সময় খোঁজ করবেন–

১। প্রেসটিজ রঙীন জাঙিয়া
২। রঙীন ড্রয়ার্স
৩। ডাক্কর জাঙিয়া
৪। ফ্রেদার-ফিট রিব গেঞ্জী
৫। ইজিপসিয়ান গেঞ্জী
৬। কুলফিল গেঞ্জী

গেঞ্জী জাঙ্গিয়া
মোজার রাজা

RAJU

ঝরঝরে
তরতাজা
হ'য়ে উঠুন
Liril
THE FRESHNESS SOAP
Liril
একেবারে আলাদা জাতের সাবান লিরিল। সবুজ তরঙ্গ—
লেবুর চনমনে সতেজতায় ভরা। ঝরঝরে চনমনে হ'তে লিরিল…
স্নানের পর আপনি হ'য়ে উঠবেন চনমনে এক অন্য মানুষ!
লিরিল
তরতাজা হ'বার সাবান
লেবুর মত চনমনে তরতাজা
লিনটাস-LR.28-203 BG
হিন্দুস্থান লিভারের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

মিলমিশ

রাখাল বিশ্বাস

কার সাথে কার মিল জোড়া ভাই
খুঁজতে গিয়ে বুঝতে পেলাম
আকাশটাকে আগলে আছে
মেঘরোদ্দুর, জানাই সেলাম।
জলের কাছে যেই গিয়েছি
মাছগুলো সব বলছে ডেকে,
"ছন্দ-মিলে সাঁতার কাটি
পালাও দাদা এখান থেকে।"
পড়ার বইয়ে মন বসালে
মিল যোগাবে স্যারের মুখ
আঁধারে মিল ভূত-পেতনির
ভয়-দেখানো, কাঁপছে বুক।
মুখোশ পেলেই মুখবদলের
বুঝতে পারি রকমফের
পাখির সাথে পালকগুলোর
মিল মাখানো পাচ্ছি টের।

ছবি দেবাশিস দেব

বল তো দেখি

অলোকনাথ মুখোপাধ্যায়

ডুমুরগাছে ফুল ফোটে কি,
ব্যাঙের কি হয় সর্দি?
হাতির তবে পাঁচ পা গজায়—
এই কথাটায় জোর দি।
ঘোড়ার ডিমের রঙটা কেমন—
সবজে? সাদা? হলদে?
দু'গালে হাত ভাবিস শুধুই,
বুদ্ধি-গোড়ায় জল দে।
একঠেঙে বক—ধার্মিক সে?
জিগেস করি তোকে—
নদীর চরে কুমির কাঁদে
বল তো কিসের শোকে?
বেড়াল যদি বাঘের মাসি,
চাঁদ তবে কার মামা?
বলতে যদি না পারবি তো
বকবকানি থামা।

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

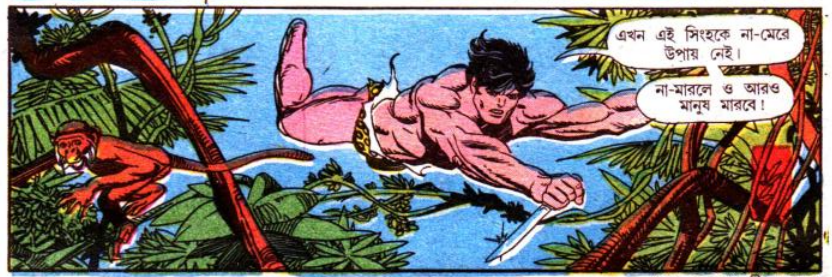

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

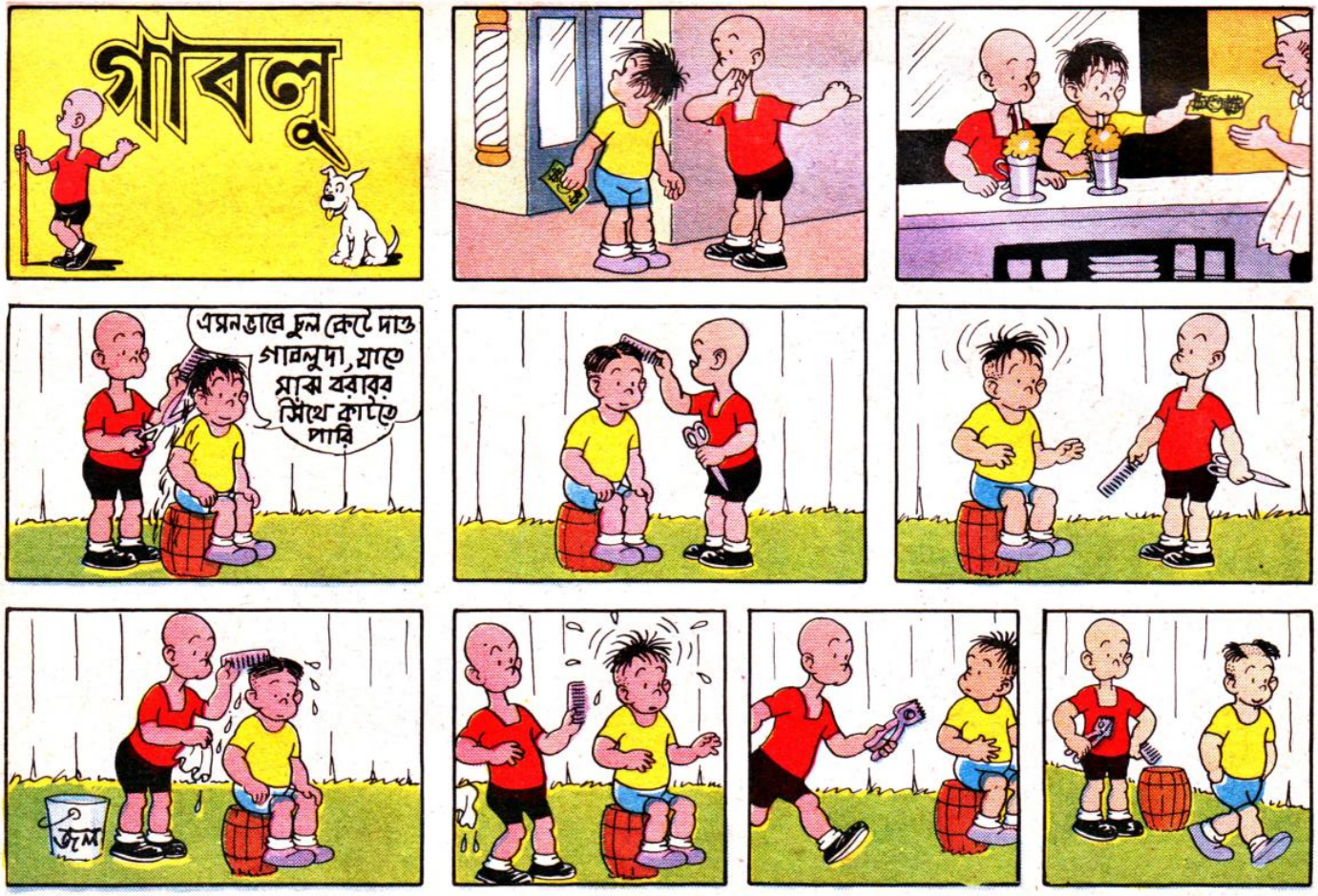
গাবলু
এমনভাবে চুল কেটে দাও গাবলুদা, যাতে মাঝ বরাবর সিঁথে কাটতে পারি
জল

জিভ ও ঠোঁটের নৃত্যনাট্য

বাচস্পতি

"স্বরধ্বনি উচ্চারণের বেলায় তাহলে তিনটে জিনিস একসঙ্গে ঘটছে," হিগিনকাকু তর্জনী তুলে বলে চললেন, "এক, স্বরতন্ত্রী কাঁপিয়ে হাওয়া আওয়াজ বয়ে আনছে, দুই, জিভ নানারকম 'পজিশন' নিচ্ছে, আর তিন নম্বর, দুটো ঠোঁট মিলে হয় গোল হচ্ছে নানারকম সাইজে, না-হয় দুপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তুই নৃত্যনাট্য দেখেছিস?"

ভণ্টু জানাল সে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা' এইসব দেখেছে।

হিগিনকাকু বললেন, "তাহলে জিনিসটা এইভাবে দ্যাখ্। গলার ঐ আওয়াজটা যেন গান। আর ঐ গানের সঙ্গে-সঙ্গে জিভ আর ঠোঁট দুয়ে মিলে নানারকমের 'পোজ' দিচ্ছে। এক-একটা স্বরধ্বনির জন্যে দুজনের এক-একরকমের 'পোজ'। ব্যালেতে একেই বলে 'পা দ দো' (pas de deux)বা 'যুগল পদক্ষেপ'।"

ভণ্টু জিজ্ঞেস করল, "তার মানে হল, স্বরধ্বনি আলাদা হলে জিভ আর ঠোঁটের পোজও আলাদা হবে?"

"এক্কেবারে শতকরা দুশো ভাগ ঠিক বলেছ।" খুব খুশি হলেন হিগিনকাকু, "এবার শোনো কোন্ স্বরধ্বনির বেলায় নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ জিভ আর ঠোঁটের কি পোজ দাঁড়াচ্ছে।"

ভণ্টু 'বলো' বলাতে হঠাৎ চটে উঠলেন আবার। "বলো মানে কী, অ্যাঁ? আমি বলব, আর তুমি বুঝে যাবে? যা, একটা খাতা নিয়ে আয়! লিখে দিচ্ছি—পরে বারবার দেখে শিখে রাখবি ব্যাপারটা!"

ভণ্টু একটা খাতা নিয়ে এল। হিগিনকাকু বলতে লাগলেন—

ই বলছি, ঠোঁট দু-কানের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে আর জিভের আগা বেশ উঁচু হয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। (কিন্তু হিগিনকাকু খাতায় লিখলেন ই = [+উর্ধ্ব, +সম্মুখ, +ছড়ানো])।

উ বলছি, ঠোঁট সরুমতন গোল হচ্ছে, জিভ পিছন দিকটা বেশ উঁচু করে পিছিয়ে যাচ্ছে, প্রায় আলজিভের গোড়া ছুঁইছুঁই। (লিখলেন উ= [+উর্ধ্ব, +পশ্চাৎ, +গোল])।

এ: ঠোঁট ফাঁক করে ছড়ানো, জিভ মাঝামাঝি উঁচু হয়ে সামনে এগুচ্ছে। (এ = [+ মধ্য, + সম্মুখ, + ছড়ানো])।

ও: ঠোঁট একটু বড়সড়ো গোল, জিভ পিছিয়ে মাঝামাঝি উঁচু হচ্ছে (ও = ([+মধ্য, +পশ্চাৎ, + গোল])।

অ্যা: ঠোঁট বেশ খোলা, তবে ছড়ানো; জিভ না-উঠে একটু এগিয়ে যাচ্ছে। (অ্যা = [+ নিম্ন, + সম্মুখ, + ছড়ানো])।

অ: ঠোঁট বেশ বড় গোল, জিভ উঁচু হচ্ছে না, কিন্তু পিছোচ্ছে। (অ = [+ নিম্ন, + পশ্চাৎ, + গোল])।

আ: মুখের বিরাট হাঁ; জিভ না উঠছে, না এগোচ্ছে, না পিছোচ্ছে। (আ = [নিম্ন + কেন্দ্রীয়])।

খাতাটা ভণ্টুকে ছুঁড়ে দিয়ে হিগিনকাকু বললেন, "বাই-বাই! পরের দিন বুঝিয়ে দিবি নৃত্যনাট্যের চিত্রনাট্য।" (ক্রমশ)

চামেলিও কাগজ পড়ে

প্রসাদ

এক-একদিন সকালে বড়দের দেখাদেখি চামেলিও খবরের কাগজ নিয়ে বসে। কিন্তু কাগজের প্রথম পাতায় বড়-বড় করে যে-সব খবর ছাপা থাকে, তা বেশির ভাগ দিনই চামেলির একদম বাজে মনে হয়। একটুও পড়তে ইচ্ছে করে না। দাদা খেলার পাতাটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, তাতেও চামেলি কোনো মজা পায় না। বরং কোথাও আগুন-টাগুন লাগলে কিংবা চুরি-ডাকাতি হলে সে-খবর চামেলির মনে হয় সত্যিকারের খবর, খুব মন দিয়ে পড়ে। কিন্তু এত বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজটাকে কেন যে কাগজওলারা ভর্তি করে দেয়, সে বুঝতে পারে না। বিজ্ঞাপন কে পড়ে? বাবাকে সে একদিন সেই কথাই জিজ্ঞেস করল।

Chameli: Why do they put all those advertisements in the paper, Daddy? Does anybody read them?

Father: They are put in the paper for people to read them.

Chameli: Who read them? I don't. Do you?

Father: Sometimes I do. If I needed a new car, for example, I would read advertisements of cars. Or if I wished to sell my car, I would look for an advertisement by somebody who wished to buy one. In fact, I may have to advertise soon for a tutor to help your brother. Now, if nobody reads advertisement that will be so much money down the drain. You have to pay, you know, for your advertisement to appear in a newspaper.

Chameli: But why are there so many advertisements in this paper? I wish there were not so many.

Father: It's because many people read this paper.

এ-সব শুনতে-শুনতে চামেলির মনে হল, দেখি তো পড়ে কী আছে বিজ্ঞাপনে।

Chameli: Look here, Daddy. Somebody has advertised for a young girl to look after a child. Here's another for an elderly man to teach a school girl mathematics. But it says, "Apply box no. 2391." What can that mean, Daddy? How can you apply to a box?

Father: When you use a box number instead of your name, it means you don't want your name to be known. The newspaper arranges for the replies to be delivered to your home.

লক্ষ করো :

They are put in the paper for people to read them.

You pay for advertisements to appear in papers.

Somebody advertised for a girl to look after a child.

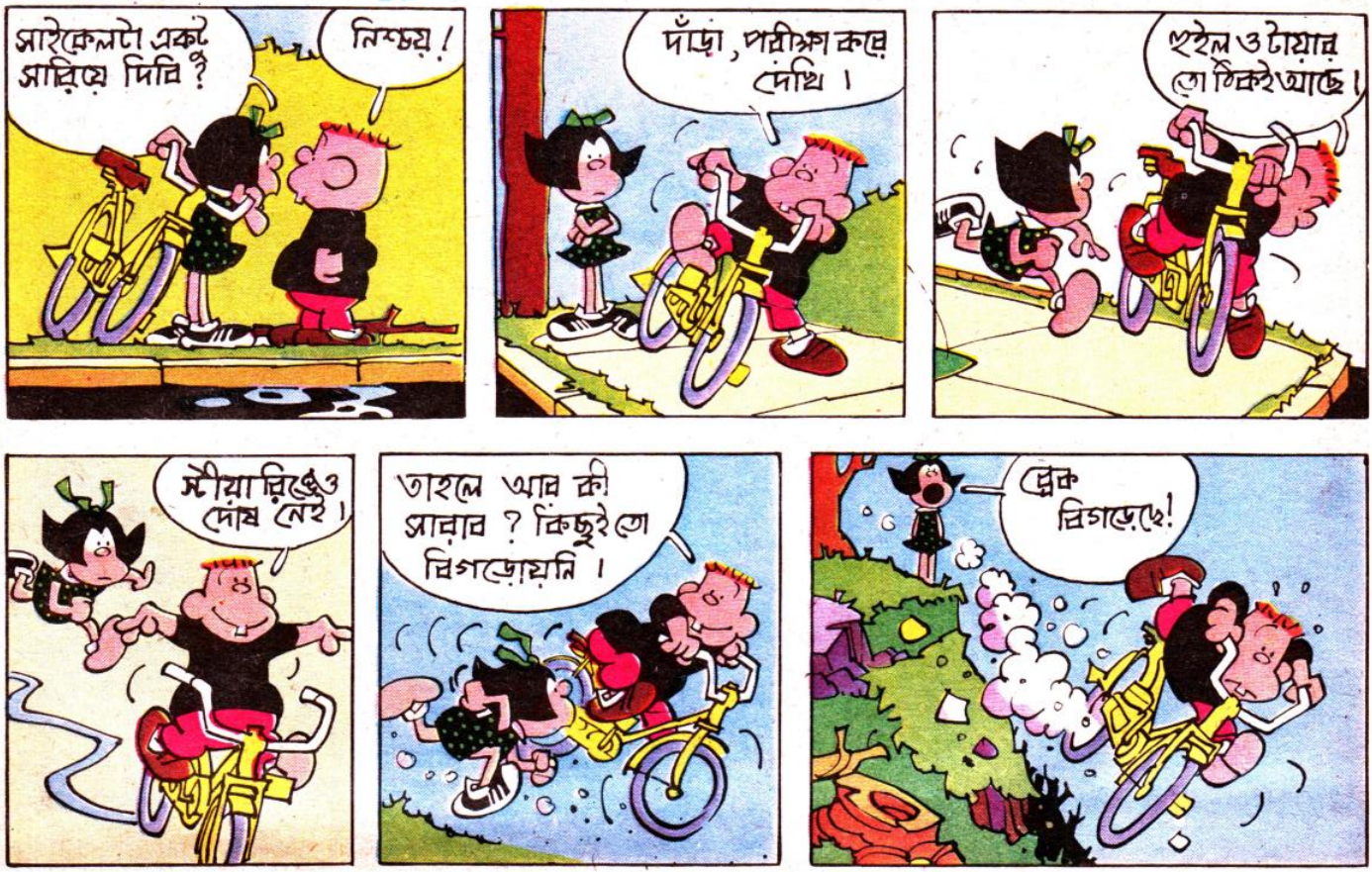
সাইকেলটা একটু সারিয়ে দিবি ?
নিশ্চয় !
দাঁড়া, পরীক্ষা করে দেখি ।
হুইল ও টায়ার তো ঠিকই আছে !
সীয়ারিংয়েও দোষ নেই ।
তাহলে আর কী সারাব ? কিছুই তো বিগড়োয়নি ।
ব্রেক বিগড়েছে!

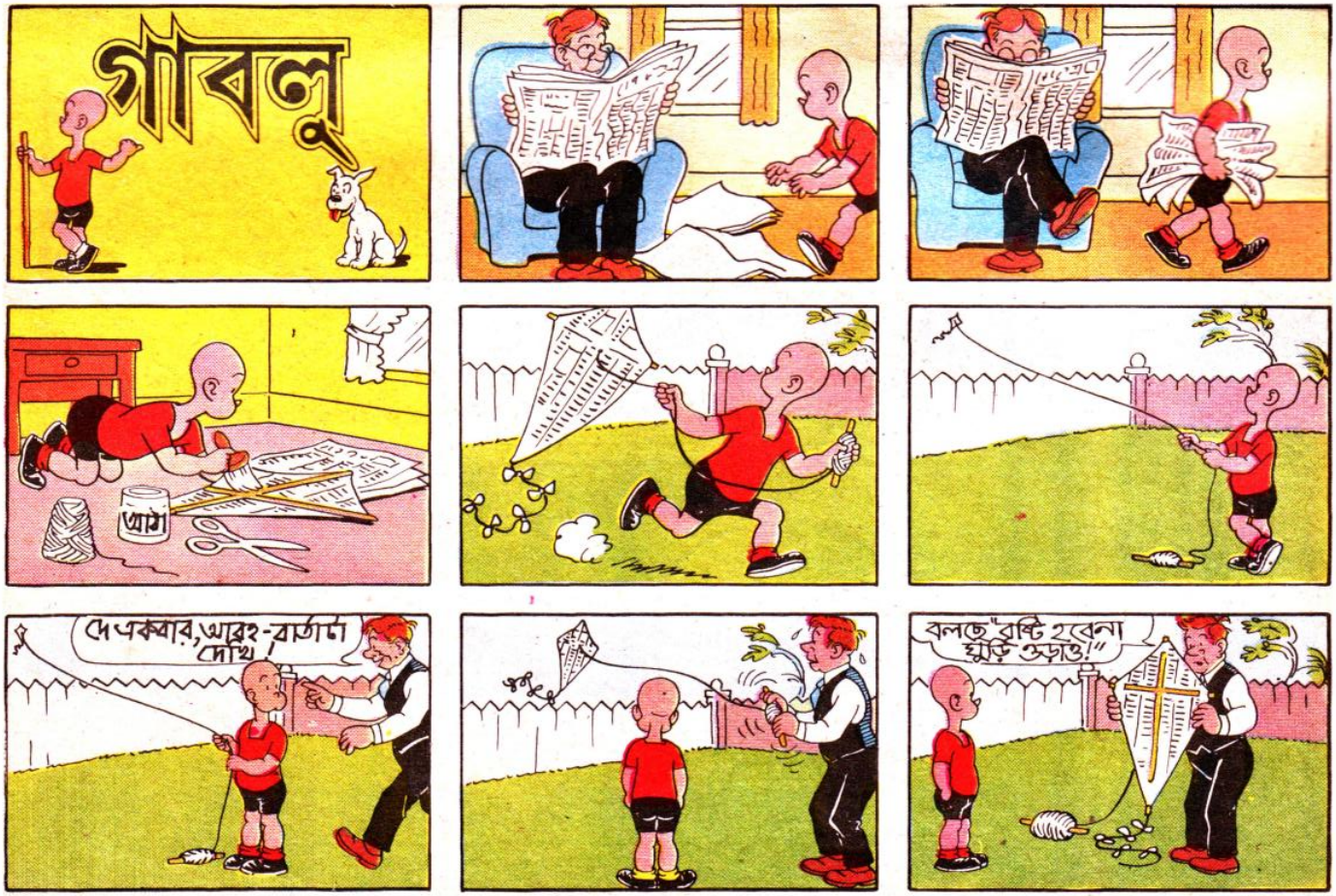

গাবলু
আঠা
দে একবার, আবহ-বার্তাটা দেখি!
বলছে "বৃষ্টি হবেনা ঘুড়ি ওড়াও!"

ডিম থেকে জোড়া পাখি

প্রথম নমুনায় ডিমকে মাঝামাঝি ভাগ করে নিয়েছি। তার পরের নমুনায় দ্যাখো কেমনভাবে দুটি পাখি তার আকার নিয়ে চুপ করে বসে আছে। পাখি করার সময় বিশেষ করে আকারের বিশেষত্বের দিকে নজর দিও। তাতে পাখি বা যে-কোনো আকারকে ধরা সোজা হবে।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

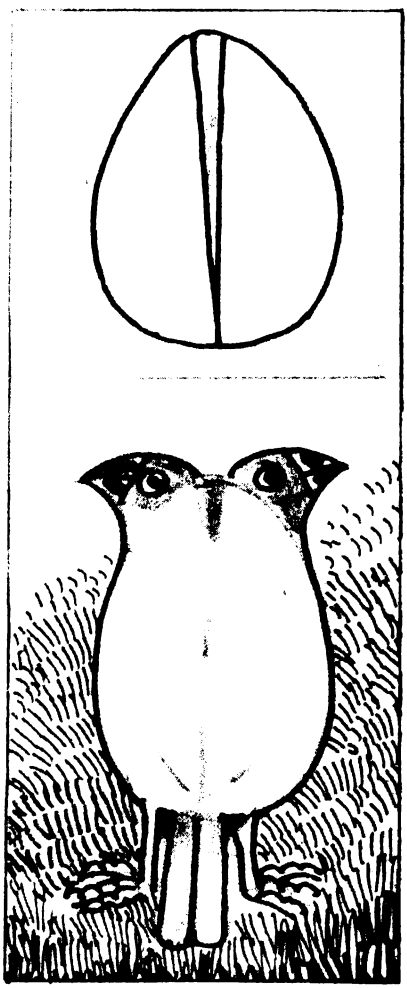

কার্ডবোর্ডের কাজ : বাক্স—৪

তোমার ইচ্ছেমতো চৌকো মাপের বোর্ড নিয়ে তাকে সমান ষোলো ভাগে ভাগ করে নাও। নমুনায় দেখানো ওপরের ২ নং কালো চৌকো অংশ কেটে বাদ দাও। 'খ' চৌকোর দুধারে কেটে (১—১) নিয়ে তার বাইরের গায়ে আঠা লাগিয়ে **প্রথম** 'গ' আর দ্বিতীয় 'গ'-এর গায়ে আঠা লাগিয়ে 'ক' অংশ জুড়ে দিলেই বাক্স তোমার হাতে।

জেনে রাখো—(১) ১ নমুনায় দেওয়া ফোঁটা-ফোঁটা দাগের ওপর দিয়ে ছুরির উলটো দিক দিয়ে চাপ দিয়ে দাগ দিয়ে নিলে ভাঁজ করতে সুবিধে হবে। (২) এই কাজের মস্ত দিক হল **মাপ** আর **পরিচ্ছন্নতা**। (৩) তোমার **নিজের** ইচ্ছেমতো বাক্স ছোট বা বড় করতে পারো, কিন্তু বাক্স যত বড় করবে বোর্ড তত শক্ত হলে ভাল।

—কারিগর

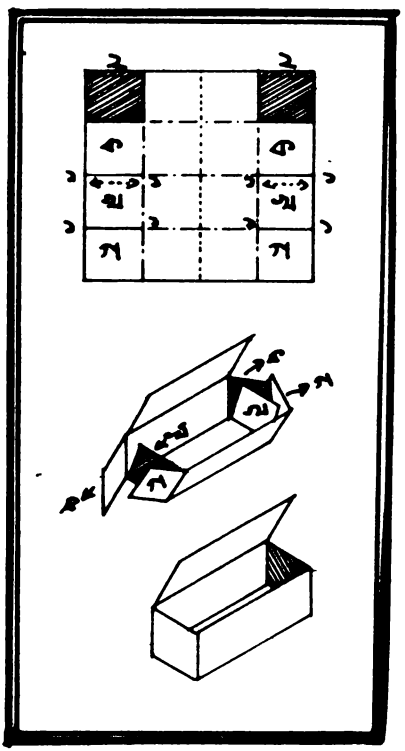

ফরহ্যান্স— দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেস্ট

দাঁত সাফ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মাড়ি মজবুত করতে সাহায্য করে

মাড়ির গোলমাল হলে এমন কি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন, দাঁত ঠিক মত সাফ না করলে প্লাক নামে জীবাণুর যে পাতলা পর্দা আপনার দাঁত আর মাড়িতে সবসময়ই জড়িয়ে থাকে, তা জমে ওঠে। এই প্লাক দন্তমলে পরিণত হয়ে মাড়ি দুর্বল ক'রে ঠেলে দেয়, ফলে এমন কি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে। মাড়ির গোলমাল সাধারণ স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করতে পারে।

ফরহ্যান্স মাড়ি রক্ষা করে

ডাঃ ফরহ্যান্সের শক্তিশালী অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট ক্রিয়ার অদ্বিতীয় ফরমুলা আপনার মাড়ি মজবুত করে তোলে, ফলে আপনি মাড়ির গোলমাল রোধ করতে পারেন। কাজেই, আপনার দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন, ফরহ্যান্স টুথপেস্ট আর ফরহ্যান্স ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ দিয়ে।

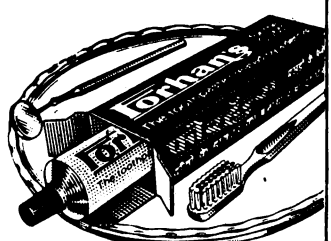

ফরহ্যান্স — মাড়ির জন্যে

Regd. T.M: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

25IF-172 BEN

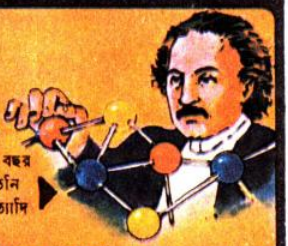

জীবন ও হনু পেল
প্রতিভার সন্ধান
প্রতিভা হ'ল এক সহজাত এবং অসাধারণ কল্পনাপ্রবণ সৃজনী এবং উদ্ভাবনী শক্তির ক্ষমতা। যে সব শিশুর মধ্যে এই লক্ষণ দেখা গেছে তাদের বলা হয় প্রতিভাধর শিশু।
আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) এক গুণী বৈজ্ঞানিক। তিনি পদার্থবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং ২৫ বছর বয়সে আপেক্ষিকতাবাদ উদ্ভাবন করেন। এর মাধ্যমে তিনি অভিকর্ষ, তড়িতচুম্বন বিজ্ঞান এবং পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি নিয়মও উদ্ভাবন করেন।
বহুমুখী প্রতিভাশালী ব্যক্তি খুবই বিরল—ইটালীর লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) হলেন সে রকম একজন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একাধারে শিল্পী, ভাস্কর, ইঞ্জিনিয়ার ও স্থপতি। তাছাড়া তাঁর অধ্যায়নের বিষয় ছিল অনেক : দৈহিক গঠনতন্ত্র, প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং আকাশতত্ত্ব। শুধু অধ্যয়ন নয়, উদাহরণদায়ক চিত্র ও নকশাসহ তিনি এ বিষয়ে তাঁর নোটবুকে সব লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শিল্পী হিসেবে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল মোনালিসা—যা হল পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান চিত্র!
শ্রীনিবাসন রামানুজম (১৮৮৭-১৯২০) আমাদের দেশের এক প্রতিভাশালী গণিতজ্ঞ। ১৬ বছর বয়সে তিনি ৬০০০টি উপপাদ্য সংগ্রহ করে নিজেই তার সমাধান করেন। তৎকালীন গণিত সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও রামানুজম নিজেই কয়েকটি উপপাদ্য উদ্ভাবন করেন। ইংল্যাণ্ডে, রামানুজম হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি রয়্যাল সোসাইটি অফ লণ্ডনের সদস্য নির্বাচিত হন। আজ পর্যন্ত কোন গণিতজ্ঞই ভগ্নাংশকে প্রসারিত করার দক্ষতায় তাঁর সমকক্ষ হতে পারেন নি।
শৈশবেই সঙ্গীতের জগতে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে পরবর্তী জীবনে যশস্বী হয়েছেন অস্ট্রিয়ার সুরস্রষ্টা ডবল্যু এ মোৎজার্ট (১৭৫৬-১৯৪২)। ৫ বছর বয়স থেকে তিনি সুরের জাল বোনা শুরু করেন। তারপর বেহালা বাদনে দক্ষতা অর্জন করে সাধারণের সমক্ষে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ১৬ বছর বয়সে, তিনি বেহালা আর পিয়ানোর মধ্যে শেষেরটিকেই বেছে নেন এবং ঐ বয়সেই তিনি ঐ বাদ্যযন্ত্রটির ব্যবহারে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন!
জীবন বীমা আপনার
ভবিষ্যতের সুরক্ষার সবচেয়ে
নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ উপায়।
এ সম্পর্কে বিশদ জেনে নিন।
যোগক্ষেমং বহাম্যহম্
ভারতীয়
জীবন বীমা নিগম
daCunha-LIC-113 BN
এবার : জীবন ও হনুর আরো জ্ঞান সঞ্চয়, নোবেল পুরস্কারের পা'য় পরিচয়